দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৮ সংখ্যা
১৩ নভেম্বর, ২০২৩
২৬ কার্তিক - ১৪৩০
যুগাব্দ - ৫১২৫

দীপাবলী সংখ্যা

website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

৭৬ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২৬ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৩ নভেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘মেতে’ শাসকের বদলে ‘মত্ত’ শাসক
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বালু চরে গভীর খাদ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

দীপাবলীর প্রতিজ্ঞা হোক চীনাপণ্য বয়কট
◻ অম্লান কুসুম ঘোষ ◻ ৮

কলকাতায় বনেদি বাড়ির কালীপূজা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

হিন্দু বিতাড়ন, হিন্দু মন্দির ও মূর্তিভাঙা কেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াল ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১১

তিব্বত তার হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে উন্মুখ
◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১৩

সন্ত্রাসবাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখানো কখনও কাম্য নয়
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৬

মাতৃপূজায় তামসিকতার অবসান ঘটাতে হবে
◻ তরুণ কুমার পণ্ডিত ◻ ১৭

দীপাবলী আজ এক সর্বজনীন উৎসব
◻ ধীরেন দেবনাথ ◻ ২৩

বঙ্গ ও বাঙ্গালিকে করুণাধারায় সিক্ত করেছে মা কালী
◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ২৫

রোগ প্রতিরোধের জন্যই ভূতচতুর্দশীতে চোদ্দশাক খাওয়ার বিধান
◻ অচিন্ত্যরতন দেব ◻ ৩১

বহুবার নাম বদল হয়েছে শ্রীশ্রী মা বোল্লা রক্ষাকালীর
◻ দেবব্রত রায় ◻ ৩৪

মালদা জেলার প্রাচীনতম ও জাগ্রত কালী
◻ মালবিকা ঠাকুর ◻ ৩৪

শক্তির দেবী এবং শক্তি সাধনার সাহিত্য-কথা
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৫

সাধক কমলাকান্তের কালী সাধনা ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৩৭

আদ্যাশক্তি মহাকালী ◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ স্মরণে : ৪৫ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮

—ঃ প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ—

বর্ধমান বোরহাটের কমলাকান্ত কালীমাতা।

প্রকাশিত হবে ২০ নভেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২০ নভেম্বর, ২০২৩

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ— ভবিষ্যৎ কী ?

হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ কি শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড দখলের লড়াই ? দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লড়াই ? তা কিন্তু নয়। হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের কঠোর প্রত্যাঘাত সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার লড়াই। মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই।

সন্ত্রাসবাদ আর সন্ত্রাস-বিরোধী— বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত। কারা কোন পক্ষে তা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে, এই লড়াই কি আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেবে ?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, আনন্দমোহন দাস, সাধন কুমার পাল, সুদীপ নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আলোর উৎসবে হউক কলঙ্কের অবসান

উপনিষদের ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’ বাণীর প্রতিফলিত প্রতীকী রূপ হইল দীপাবলী উৎসব। এইজন্যই ভারতবর্ষীয় যে কোনো শুভানুষ্ঠানে দীপ প্রজ্বলনের বিধি রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই উৎসব বহু ঘটনার সাক্ষী। সমুদ্র মন্থনের সময় এই তিথিতেই ধনসম্পদের দেবী মা লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার আগমনে দেবতারা প্রদীপ প্রজ্বলন করিয়া তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন। এই দিনেই চৌদ্দ বৎসর বনবাসান্তে শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতামাতাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। অযোধ্যা কুলতিলকের প্রত্যাবর্তনে সেইদিন অযোধ্যাবাসী সমগ্র নগরীকে আলোকমালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসান্তে দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডব এই দিনেই হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিলে নগরবাসী রাজধানীকে আলোকমালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। মহাবীর জৈনও এই দিনেই আলোকোদ্ভাসিত হইয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনেই চতুর্থ শিখগুরু রামদাস অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির তথা হরমন্দির সাহিবের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। পুরাণকথায় উল্লেখ রহিয়াছে, এই উৎসব শুধু মর্ত্যজীবনের উৎসব নহে, স্বর্গলোকেরও উৎসব। এই উৎসবে স্বর্গ-মর্ত্য একাকার হইয়া যায়। স্বর্গগত পিতৃপুরুষদিগের পথকে আলোকিত রাখিবার জন্য কার্তিক মাসব্যাপী আকাশপ্রদীপ জ্বালাইবার বিধি রহিয়াছে। ছন্দের জাদুকর তাই বোধহয় লিখিয়াছেন, ‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি।’

এই উৎসব যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনকেই শুধু আলোকিত করে নাই; বিশ্ববাসীকেও আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্যই বিশ্বের দেশে দেশে সাড়ম্বরে দীপাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে। কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও তাঁহাদের দপ্তর অথবা বাসস্থানে এই উৎসবের আয়োজন করিতেছেন। দীপাবলী উৎসবকে মান্যতা দিয়া নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, গায়ানা, সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, ত্রিনিদাদ, সুরিনাম প্রভৃতি দেশ সরকারি ছুটি ঘোষণা করিয়াছে। কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ছুটি না থাকিলেও তাহারা আলোকমালায় সাজিয়ে তোলেন তাহাদের দেশ। পুনরায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বসঞ্চার ঘটিতেছে, ইহা খুবই গর্বের বিষয়। ভারতে দীপাবলী নিশিতেই শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মা কালী মা দুর্গারই রূপভেদ। তিনিও আলোকস্বরূপা। তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইলেও সাধক ধ্যানদৃষ্টিতে তাঁহাকে জ্যোতির্ময়ী রূপেই দেখিয়া থাকেন।

ভারতে সর্ব সম্প্রদায়ের উৎসব এই দীপাবলী। উত্তর ভারতে পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতে নরকাসুরের পরাজয়ের স্মরণে এই উৎসব পালিত হইয়া থাকে। বাস্তবে, ইহা নিজের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করিবার উৎসব। দীপাবলীর আর একটি তাৎপর্যময় দিক হইল, অলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া মা লক্ষ্মীকে পুনঃস্থাপনা করিবার দিন। এই তাৎপর্যটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদিগকে বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। রাজ্যের সর্বস্তরে এই সময়ে অলক্ষ্মীর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। তাহার ফলে এই রাজ্যের সর্বত্র ঘোর অন্ধকার। সেই ঘোর অন্ধকারে চৌর্যবৃত্তির বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়াছে। চৌর্যবৃত্তিধারীদের হস্তেই এখন এই রাজ্যের শাসনভার। চৌর্যকার্যের দায়ে এই রাজ্যের মন্ত্রী-সান্ত্রীদের অনেককে জেলের ঘানি টানিতে হইতেছে। বাঙ্গালি জীবনে ইহা বড়োই লজ্জা ও কলঙ্কের। আলোকের উৎসবের এই দিনে বঙ্গবাসীকে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে অলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া মা লক্ষ্মীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার। দেবীর পুনঃস্থাপনা করিয়া আলোর এই উৎসবকে আরও আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাতে বঙ্গবাসীর লজ্জা ও কলঙ্কের অবসান ঘটিবে।

সুভাষিতম্

পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি জলমন্নং সুভাষিতম্।

মূঢ়ৈঃ পাষাণখণ্ডেষু রত্নসংজ্ঞা বিধিয়তে।। (চাণক্যনীতি)

এই পৃথিবীতে জল, অন্ন ও সুভাষিতই হলো রত্ন। কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞানীরা ছোটো ছোটো প্রস্তরখণ্ডকেই রত্ন মনে করে।

'মেতে' শাসকের বদলে 'মত্ত' শাসক

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের 'প্যাঁচী ভিখারি' তার পায়ের ক্ষত সারায় না, ভিক্ষা পাবে না বলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্যাও পা নিয়ে। তবে একটু অন্য ধরনের। তাতে মিশে রয়েছে দল আর নতুন নেতৃত্ব ঘিরে তাঁর আশঙ্কা আর হতাশা। যুক্ত হয়েছে পরিবারের অসীম দুর্নীতি। এ রাজ্যে বাম-কংগ্রেস মূল্যহীন ভোট কাটুয়ার দল। বিজেপিকে রুখতে মমতা তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাই শামিল হয়েছেন 'ইন্ডি' বা 'ফুটো' জোটে। মমতার জোটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেই। ৫ রাজ্যের আসন্ন ভোটে বিজেপির উপরি পাওনা হতে চলেছে রাজস্থান। আমার ধারণা, বাম-কংগ্রেসের ধ্বংস হলেই মমতার পতন অবশ্যম্ভাবী। মমতার বিকল্প কেবল বিজেপি।

২০২১-এর বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেস ৭ শতাংশ অপ্রাসঙ্গিক ভোট কেটে মমতাকে জিতিয়ে দেয় আর বিজেপিকে ৯ শতাংশ ভোটে মমতার থেকে পিছিয়ে দেয়। মমতা ৪৮ আর বিজেপি ৩৯ শতাংশ ভোট পায়। মমতার ভিক্ষাপাত্র রাজ্যের ১২৮টি সংখ্যালঘু আসন। সদ্যোজাত আইএসএফের হাত থেকে ভিক্ষা কটোরি বাঁচাতে মমতা ফুটো জোটে শামিল হয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই, সংখ্যালঘু ভোট বাম-কংগ্রেসের দিকে সরিয়ে দেওয়া। তাতে দুর্বল হয়েও তিনি নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারবেন। তাই বাম-কংগ্রেসের তৈরি 'ঘা' মমতা শুকোতে চান না। ফলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের লড়াইয়ে চুপ থাকেন। মমতা বামেদের ঐতিহ্য রেখেছেন। সংখ্যালঘু ভোট হারানোর ভয়ে তাত্ত্বিক বাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয় দিতে ভয় পেয়েছিলেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এখন সব ধরনের চুরির অভিযোগ। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হতে চলেছে তার দলের সাংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ভঙ্গের অভিযোগ। সব জেনে বুঝেই দু'বারের সাংসদ মমতা বোবা সেজে গিয়েছেন।

অপেক্ষাকৃত কচি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'ভ্যানিশ' হয়ে গিয়েছেন। উভয়ে জানেন চুরি নিয়ে মিথ্যা গলাবাজি করা গেলেও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে তা করা যায় না। তাই দলের শিশু-সাংসদ মহুয়া মৈত্র তৃণমূল আর সংসদ থেকে যে 'ভোকাট্টা' হতে চলেছেন তাদের নীরবতাই তা নিশ্চিত করে দিয়েছে। কয়েকদিন আগেই মমতার একদা প্রিয় জ্যোতি মল্লিক (বালু) রেশন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। দলের চোরেদের বাঁচাতে মমতা যত তৎপর শিশুবৎ মহুয়কে তার থেকে অনেক সহজেই ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন। শিশুটির কান্না শোনা যাচ্ছে। মমতার প্রিয় 'বালুর' পর তাঁর অতিপ্রিয় 'বাবু' (অভিষেক) যে ভোটের আগে আটক হতে পারেন এ গাওনা তিনি আগেই গেয়ে রেখেছেন। হলফ করে বলতে পারি চতুর রাজনীতিক মমতার বহু অনৃত (মিথ্যা) ভাষণের মধ্যে এটা সত্য। রাজনৈতিক মহলের ধারণা অভিষেকের গ্রেপ্তার অবশম্ভাবী। বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর বহু ন্যায্য দাবির মধ্যে এটি একটি।

> **মমতার প্রিয় 'বালুর' পর তাঁর অতিপ্রিয় 'বাবু' (অভিষেক) যে ভোটের আগে আটক হতে পারেন এ গাওনা তিনি আগেই গেয়ে রেখেছেন। হলফ করে বলতে পারি চতুর রাজনীতিক মমতার বহু অনৃত (মিথ্যা) ভাষণের মধ্যে এটা সত্য।**

মমতার নেতা-মন্ত্রীদের এখন কলির সন্ধ্যে। তাদের সামনেই ঘোর কলি। রাজ্যপাটের কিছু প্রতীকী বিশ্লেষণের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে দেশ বিরোধী, কিছু ব্যবসায়িক জিহাদি শক্তি। পাঠকরা যেন সে ফাঁদে পা না দেন। সম্পাদককে পত্র লিখে ব্যাখ্যা চেয়ে নিন। মমতা আর অভিষেক লোকসভা ভোটে প্রার্থীর দড়ি টানাটানিতে ব্যস্ত। 'নেইমামা'-রা বাদ পড়বেন আর 'কানামামা'-রা প্রার্থী হলেও হতে পারেন। শুনেছি ৪২ আসনে তৃণমূল এক-তৃতীয়াংশ নতুন মুখ দেবে। বাদ পড়া বৃদ্ধের দলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অন্ধ মমতাপন্থীরা বেঁচে যাবেন আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা হয়তো কাটা পড়বেন। নেইমামা আর কানামামার তালিকায় সঠিক প্রার্থী বাছাই অভিষেকের বড়ো চ্যালেঞ্জ। লোকসভা ভোটে তিনি মূল চালক। মমতা সহ-অভিনেত্রী। আমার সন্দেহ, অভিষেক লোকসভা ভোট লড়বেন না। খুব শীঘ্রই মমতা তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করবেন। তবে তাতে তাঁর আটক বা গ্রেপ্তারের অবশ্যম্ভাবী মমতা-ঘোষণা বাতিল হয়ে যাবে না। ■

বালু চরে গভীর খাদ

বালুস্নেহদায়িনী দিদি,

কয়লা থেকে বালু, অনেকে কেলেঙ্কারি নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন দিদি আমি জানি। কিন্তু এখন অন্য বালু চর দেখে ভয় করছে। তিনি বলে দিচ্ছেন প্রকাশ্যে যে, আপনি সব জানেন। তিনি নাকি মুক্ত। ইডিও নাকি বুঝে গিয়েছে আপনিই সব জানেন, বালু মানে আপনার মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় দাদা, মুক্ত পুরুষ।

তাঁর সম্পত্তি, কন্যা ও স্ত্রীর সম্পত্তি সবই তদন্তের মধ্যে কিন্তু খাদ্যদপ্তরে যে বিপুল দুর্নীতি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তাতে রাজ্যবাসীর বিস্ময়, আতঙ্ক ও বিরক্তির সীমা নেই দিদি। সবাই বলছে, লালু পশুখাদ্য খেয়ে নিয়েছিলেন। জেলও খেটেছেন। আর আপনি মানে আপনার সরকার মানুষের খাদ্য খেয়ে নিয়েছে? যে খাদ্য কিনা কেন্দ্রীয় সরকার বিনা পয়সায় পাঠায় রাজ্যের গরিব মানুষের জন্য। ভাবা যায় দিদি! আপনার মতো গরিবদরদি নেত্রী এটা মেনে নিলেন কী করে? আপনি নাকি কিছুই জানতেন না। এখনও পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে সেকথা আপনি বলেননি। যেটা পার্থদাদা গ্রেপ্তারের পরে বলে দিয়েছিলেন। কেন দিদি? বরং, আপনি বলছেন বালু নাকি সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করেছিলেন। কিন্তু জনগণ তো অত বোকা নয় দিদি। তাঁরা জানেন ভুয়ো রেশন কার্ড বাম আমল থেকেই ছিল। আর তা আপনি ক্ষমতায় আসার পরে প্রিয় ভাই বালুর সময়ে আরও বাড়ে। তার থেকে দু'নম্বরি রোজগারও বাড়ে। আর নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে যখন বললেন, আধারের সঙ্গে রেশন কার্ড যুক্ত করতে হবে তখনই দেখা গেল এক কোটি ভূতের নামে রেশন কার্ড রয়েছে। তাঁদের নামের চাল, গম, চিনি কে নিত দিদি? কেন্দ্রের তৎপরতায় বাতিল হওয়াটাকে আপনি যে আপনার বালুর কৃতিত্ব বলছেন সেটাকে মানুষ 'নির্জলা মিথ্যা' বলে দাবি করছে। তাতে আমি মোটেও খুশি নই। কারণ, আমার দিদিকে কেউ 'মিথ্যেবাদী' বলবে আর আমি ধেই ধেই করে নাচব এমন ভাইটি নই আমি।

কিন্তু বালুদাদার গতিপ্রকৃতি আমার ভালো লাগছে না দিদি। আপনি আর ভাইপো সব জানেন বলে যে ভাবে হুংকার ছড়াচ্ছেন, জামিন না চেয়ে ইডি হেফাজতেই থাকতে চাইছেন, তাতে ভয় করছে। আপনার মতো আমারও। সব বলে দিচ্ছে না তো! 'কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম' বলে দিলে কিন্তু খুবই মুশকিল। আপনিও সেটা বুঝতে পেরে বালুকে ছেটে ফেলতে পারছেন না। জেলে বসেও তিনি আপনার মন্ত্রী। তাঁর কন্যা আপনার আধিকারিক।

দিদি, এটা সবাই বলছে যে, আদালতে কোনও মন্ত্রী অভিযুক্ত হলেও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে রাজ্য সরকার মানে আপনাকেই। কারণ, সরকারের বরাদ্দ চাল পাচারে জড়িত 'সিন্ডিকেট' চলেছে স্বয়ং তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রীর 'প্রশ্রয়ে'। সরকারি টাকায় কেনা দামি চালের পাচার, নিম্ন মানের চাল আমদানি করে রেশনের মারফতে মানুষকে দিয়ে দেওয়া, চালবিক্রির ভুয়ো রসিদ এসব কি একা একা করা যায়? সরকার মানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত মাথার উপরে না থাকলে? এসব কখনও রাজ্য প্রশাসনের চোখে পড়েনি? আপনি অবশ্য এই তদন্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। সেটা সত্যি দাবি হলে ইডির উদ্ধার করা টাকা, ঘুষ দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ নথিপত্র, সাক্ষ্য সবই কি তবে ভুয়ো?

> **আদালতে কোনও মন্ত্রী অভিযুক্ত হলেও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে রাজ্য সরকার মানে আপনাকেই। কারণ, সরকারের বরাদ্দ চাল পাচারে জড়িত 'সিন্ডিকেট' চলেছে স্বয়ং তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রীর 'প্রশ্রয়ে'।**

পার্থদাদার বান্ধবীর বাড়ি থেকে টাকা, নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে, তাতে দুর্নীতির চেহারা স্পষ্ট। তিহার জেলে মেয়েকে নিয়ে থাকা বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি (এখনও) অনুব্রত মণ্ডল অবৈধ টাকা লেন-দেন করেছেন এ আর কার অজানা? আর অভিযুক্তরা কেউ ছোটোখাটো নেতা নন যে ছেলেমানুষ হিসেবে ভুল করে ফেলেছেন। সবাই তৃণমূলে এক-একটি বড়ো মুখ। যাঁদের দাপটে নিজের নিজের এলাকায় বাঘে- গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। আর তাঁদের প্রতি আপনার প্রকাশ্য সমর্থন দেখা যাচ্ছে। একই অবস্থা আপনার পরিবারের মধ্যেও। শুনেছি, আপনি আজকাল দলের কারও ফোন ধরছেন না। মন্ত্রীদেরও নয়। আসলে আপনি দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন। কিন্তু মুখে নয়। তা হলে জেলবন্দিরা মুখ খুলে ফেলবেন। কিন্তু দিদি, শারীরিক ও ফোনে দূরত্ব তৈরি করে কি এটা মুছে দেওয়া যাবে যে এঁরা সকলেই আপনার স্নেহভাজন? আপনার কথাতেই তো এতদিন তাঁরা ওঠা বসা করছেন।

যা শুনছি তাতে দীর্ঘ সময় ধরে দুর্নীতির জাল ছড়ানো হয়েছিল। রাজ্য প্রশাসন কি কিছুই জানত না? নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন করে আসছেন চাকরি-বঞ্চিত মানুষেরা। কিন্তু গত দশ বছরে রেশনে নিম্নমানের, পোকাধরা চাল যাঁরা বাধ্য হয়ে খেলেন তাঁদের কী হবে দিদি? □

দীপাবলীর প্রতিজ্ঞা হোক চীনা পণ্য বয়কট

অম্লান কুসুম ঘোষ

প্রতি বছরের মতো এসে গেল আলোর উৎসব দীপাবলী। কিন্তু এই আলোর উৎসবের মধ্যেও গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এক অন্ধকারের হাতছানি। দীপাবলিতে আতশবাজি, আলোর উপকরণ প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিস মানুষ কেনেন তার অনেকটাই কিনছেন চীনা পণ্য থেকে। সারাবছর বাজারের একটা বড়ো অংশ যেমন চীন দখল করেছে সেরকমই দীপাবলীর বাজারেরও একটা বড়ো অংশ চলে গেছে চীনের দখলে।

সাধারণ ভারতীয় ক্রেতা সস্তার মোহে পড়ে ভারতীয় পণ্যের বদলে চীনা পণ্য কিনে ফেলেন আর এর মাধ্যমেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভারত থেকে প্রতিবছর চীনে চলে যায়। গত অর্থবর্ষে চীনের সঙ্গে আমাদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা হলো চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি এবং মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা হলো ভারত থেকে চীনে হওয়া রপ্তানি। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি হলো ৫২.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২০ কোটি টাকা।

ভারতে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে চীন ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করছে। চীন যে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি লাভ করছে সেই অর্থের দ্বারা চীন নিজের এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে উন্নত করছে, তাদের জন্য এবং কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র ক্রয় করছে এবং সেই অত্যাধুনিক অস্ত্রের বলে বলীয়ান চীন ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতের সীমান্তে হামলা করছে এবং আমাদের দেশের বীর জওয়ানদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে।

চীনের অর্থবল ও অস্ত্রবল ভারতের অভ্যন্তরেও নিয়মিত প্রযুক্ত হচ্ছে ভারতের ক্ষতি সাধনের জন্য। মূলত কৃষিপ্রধান ভারত খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ভারতের প্রায় আশিটি এমন জেলা আছে যে জেলাগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। জেলাগুলি মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হতো। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে চীনের বাজার নষ্ট হবে, চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না। তাই চীন ভারতের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য এই জেলাগুলিতে মাওবাদী উগ্রপন্থীদের অর্থ ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করছে। চীনপ্রদত্ত অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান মাওবাদীরা এই সমস্ত এলাকায় এমন অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে যে এখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের শাসনব্যবস্থা।

ভারতের শিল্পোন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে চীন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায়। তার লক্ষ্য সে ভারতকে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে রেখে দিতে চায়, ঠিক ঔপনিবেশিক আমলের ব্রিটিশের মতো। বিশ্ব রাজনীতিতেও চীন ভারতের প্রতি একই রকম বৈরী ভাবাপন্ন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতকে মনোনীত করেছিল পরিষদের বর্তমান সদস্য সব কটি দেশ, কিন্তু চীন ভেটো প্রয়োগ করে ভারতকে সেই মর্যাদা পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। কূটনীতি জগতের নির্মম পরিহাস হলো এই যে চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েছিল এবং তজ্জনিত কারণে ভেটো প্রয়োগের অধিকারী হয়েছিল ভারতেরই দয়ায়। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে আমাদের পকেট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা আমাদেরই সর্বনাশ করছে। এছাড়াও চীনা পণ্য জাতীয় অর্থনীতির আর কী কী ক্ষতি করলো দেখা যাক।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ চীনাপণ্যের বিক্রি বাড়ার সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসমূহের বিক্রি হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ভারতীয় পণ্য বাজার হারাচ্ছে। ফলে ভারতীয় শিল্প চাহিদার অভাবে ভুগছে এবং শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলস্বরূপ কুটিরশিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বৃহৎশিল্পগুলি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ কুটিরশিল্পের শিল্পী এবং বৃহৎশিল্পের শ্রমিক উভয়ই বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। তাদের উপার্জন ও ক্রয়ক্ষমতা দুই-ই হ্রাস পাচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনীতির অন্য দুই ক্ষেত্র কৃষি ও পরিষেবা চাহিদা হ্রাসের মুখে পড়ে, ফলস্বরূপ তাদেরও উৎপাদন হ্রাস করতে হয় ও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ ধরতে হয়। ফলে পুনরায় চাহিদা হ্রাস ও অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই পুনরায় উৎপাদন হ্রাস ঘটে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি বেকারত্ব-ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস-চাহিদা হ্রাস-উৎপাদন হ্রাস-পুনরায় বেকারত্ব— এইরূপ এক চক্রে প্রবেশ করে।

চীনা দ্রব্যগুলি ইউজ অ্যান্ড থ্রো পদ্ধতির হওয়ায় পুরনো জিনিস সারাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কর্মচ্যুত হয়। মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে হওয়ায় এই কর্মচ্যুতির সাংখ্যিক হিসাব সম্ভব নয়, কিন্তু বড়ো সংখ্যক নিম্নবিত্ত ভারতবাসী যে এর ফলে বেকারত্বের জ্বালায় দগ্ধ হয় তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত, বংশপরম্পরায় চলে আসা বহু হস্তশিল্প যেগুলি শুধু ভারতের গৌরব-ই নয় বরং বহির্ভারতে ভারতের পরিচয়জ্ঞাপক (যেমন, বেনারসি শাড়ি, কাষ্ঠশিল্প, বাঁশের কাজ, টেরাকোটার কাজ প্রভৃতি), সেই হস্তশিল্পগুলির হুবহু নকল চীনাপণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেছে। ফলে সেই হস্তশিল্পগুলি বাজার হারাচ্ছে এবং হতাশ হয়ে শিল্পীরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ ভারতের গৌরব হিসেবে পরিচিত সেই হস্তশিল্পগুলি চিরতরে লোপ পেতে চলেছে। এককালে ব্রিটিশ অত্যাচারে যেমন ঢাকাই মসলিন বন্ধ হয়ে গেছিল, হয়তো একালে চৈনিক অত্যাচারে আরও অনেক হস্তশিল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্ষতি ভবিষ্যতেরও :

ক্ষতির এখানেই শেষ নয়, দেশের অর্থনীতির ভয়ংকরতম অবস্থা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। চীনা পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে সস্তা হয় কারণ চীনা পণ্যগুলি উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ভারতের বাজারে পাঠানো হয়। অর্থাৎ চীনা পণ্যগুলি ভারতে পাঠানো হয় সাময়িকভাবে ক্ষতি স্বীকার করে। সাময়িকভাবে এই ক্ষতি স্বীকারের পেছনে থাকে এক দীর্ঘমেয়াদি দূরভিসন্ধি। চীনের সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ভারতীয়

কারখানাসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুটির শিল্পের শিল্পীরাও অভ্যাসের অভাবে ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা হারাবে। ভারতবর্ষ তখন বন্ধ শিল্পের এক শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। ভারতীয় ক্রেতারা তখন সম্পূর্ণরূপে চীনের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেই সময়ে ভারতীয় বাজারের ওপর সেই একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নেবে চীন। তখন তারা যে দাম দেবে ভারতীয় ক্রেতাদের সেই দামেই কিনতে হবে চীনের সামগ্রী। অর্থনীতির পরিভাষায় এই অপকৌশলকে বলা হয় ডাম্পিং। এই ডাম্পিঙের চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ যদি অবিলম্বে রোধ করা না যায় তাহলে দেশের যে দুরবস্থা হবে, অনাগত সেই ভয়ংকর ভবিষ্যৎ যেন কল্পনাকেও হার মানায়।

ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গেরও :

গোটাদেশের কী ক্ষতি হবে তা তো দেখা গেল। দেশের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গও এই ক্ষতির শিকার হবে। কিন্তু বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে বেশি। বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পগুলি আগেই বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের উপার্জনের সবেধন নীলমণি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি, চীনা সস্তা পণ্যের আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে মূলত ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিকাল দ্রব্যের উৎপাদনকারী এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই। পশ্চিমবঙ্গের যুবককুলের সামনে তাই বেকারত্বের হাতছানি বড়ো প্রকট। এছাড়াও চীনের সস্তা লেড আলো বিপদে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের মৃত-শিল্পীকুলকে। চীনের সফট টয় বিপদে ফেলেছে এখানকার খেলনা নির্মাণকারী কুটিরশিল্পীদের। পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পীরাও তাই আজ বড়ো বিপদাপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎশিল্পের মধ্যে টিম টিম করে টিকে থাকা একমাত্র পাটশিল্পও আছে বিপদের মুখে। চীনের তৈরি বিভিন্ন সস্তা বিকল্প, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের নাভিশ্বাস তুলছে। দেশের মধ্যে সর্বাধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে না ও পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদেও ন্যূন। অর্থাৎ এ কথা অনস্বীকার্য যে চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসনে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ আর তাই পশ্চিমবঙ্গের লোকেদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

পরিবেশের ক্ষতি :

চীনাদ্রব্য ব্যবহারের ফলে হওয়া ক্ষতি শুধুমাত্র অর্থনীতির সীমানায় আবদ্ধ নেই। পরিবেশও চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ এসব চীনা পণ্য সাধারণত ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত হয় যা দামে সস্তা হলেও পরিবেশের ও ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র ব্যবহারকালে নয়, বরং ব্যবহারের পরে ফেলে দেবার পরও এই বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পরিবেশে মিশে যায় না, বরং দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে পড়ে থেকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ফলে দেশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকের ও সরকারের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

স্বাস্থ্যের ক্ষতি :

চীনাপণ্যগুলি মানুষের শরীরের পক্ষেও একই রকম ক্ষতিকর। চীনাপণ্য ব্যবহারকারী কঠিন অসুখের শিকার হচ্ছেন; বিশেষ করে শিশুদের ওপর এর প্রভাব পড়ছে অসীম। শুধুমাত্র চিকিৎসাব্যয়ের অর্থনৈতিক ক্ষতির মাপকাঠিতে এই ক্ষতি পরিমাপযোগ্য নয়। চীনা পণ্য চিরস্থায়ী ক্ষতি করছে দেশের মানবসম্পদে।

তাহলে সমাধান কোথায় ?

সমাধান আছে। ভারতবিরোধী সব কাজই চীন করছে এবং করবে আমাদের দেশে বিক্রিত চীনা পণ্যের মূল্যবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকেই। তাই জনসাধারণ যদি চীনের পণ্য না কেনেন অর্থাৎ চীনের পণ্য বয়কট করেন তাহলে চীন অর্থাভাবে ভারতবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। কোনও বস্তু কেনা বা না কেনা তো সম্পূর্ণ ক্রেতার হাতে। চীনা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেলেও চীনা পণ্য কিনবো কী কিনবো না সেই সিদ্ধান্ত তো সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার নিজের। ক্রেতারা যদি চীনা পণ্য না কেনেন, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহও চীনের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না।

মনে হতে পারে এতবড়ো এক আন্তর্জাতিক শক্তি চীন, তারা আমাদের দেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। শুধুমাত্র বয়কটকে অস্ত্র করে আমরা সাধারণ মানুষ কি পারবো এত বড়ো এক শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে? করা যে যায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ইতিহাসের দিকে একটু তাকালেই। আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে ১১৭টি বছর। ১৯০৫ সাল। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলো বঙ্গভঙ্গর, বললো বঙ্গভঙ্গ একটি সেটেল্ড ফ্যাক্ট। ভেবে দেখা যাক সেই সময়কার কথা। সেই ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখন সূর্য অস্ত যায় না আর ভারত সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন একটি দেশ মাত্র, সৈন্যবলে অর্থবলে অস্ত্রবলে ব্রিটিশ শক্তি তখন অজেয়। ভারতবাসী তখন অর্থাভাবে দরিদ্র, অস্ত্র রাখার অনুমতিহীন। সেই শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি সেটেল্ড ফ্যাক্ট বঙ্গভঙ্গকে ভারতবাসী 'আনসেটেল্ড' করে দিয়েছিল শুধুমাত্র বিদেশি পণ্য বয়কট করার মাধ্যমে। শুধুমাত্র ভারতীয়রা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট শুরু করতেই টনক নড়েছিল ব্রিটিশ সরকারের। বাধ্য হয়েছিল তারা পশ্চাদপসরণ করতে, বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হয়েছিল। সেদিন দরিদ্র পরাধীন অস্ত্রহীন ভারতবাসী যা করতে পেরেছিল আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের সপ্তম শক্তিধর দেশের নাগরিক ভারতবাসী আমরা কি তা করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো, যদি সেদিনের মতো আজও আমরা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পারি। সেদিনের ভারতবাসী যেমনভাবে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করেছিল সেরকমভাবে আমরাও যদি চীনা পণ্য বয়কট করতে পারি, আমরাও যদি সেদিনের মতো দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারি। এই দীপাবলীতে যদি প্রতিজ্ঞা করতে পারি একটিও চীনা দ্রব্য কিনবো না, তবেই আমরা চীনের আগ্রাসনকে সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে পারবো।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

কলকাতায় বনেদি বাড়ির কালীপূজা

স্বস্তিকা দপ্তরের খুব কাছেই তারক প্রামাণিক রোড। আর সেই রাস্তার একপাশে দেড়শো বছরের বেশি পুরানো প্রামাণিক বাড়ি। এই বংশের মদনমোহন প্রামাণিক আন্দাজ উনিশ শতকের প্রথম দিকে কোনো এক সময়ে হুগলি জেলার সাহাগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসে কাঁসা-পিতলের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর পুত্র গুরুচরণ পৈতৃক কাঁসার ব্যবসার পাশাপাশি সালকিয়ায় গঙ্গার ধারে 'ক্যালেডোনিয়া ডক' নির্মাণ করে জাহাজ মেরামতির কারবার আরম্ভ করেন। গুরুচরণ প্রামাণিকই সিমলা অঞ্চলে (বর্তমান তারক প্রামাণিক রোড) বসতবাটী নির্মাণ করে দুর্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে কালীপূজা ও কার্তিকপূজাও শুরু করেন। তবে পারিবারিক ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে গুরুচরণের পুত্র তারক প্রামাণিকের হাত ধরে। যাঁর নামে তারক প্রামাণিক রোড। ব্যবসার সঙ্গে প্রামাণিক পরিবারের পূজারও সমৃদ্ধির শুরু উনিশ শতকের শেষদিকে তারকনাথ প্রামাণিকের সময়কালে। এককালের আদ্যন্ত ব্যবসায়ী পরিবার। তাই কাঁসা-পিতলের কারবার এখন না থাকলেও, পারিবারিক ধারাকে সম্মান জানিয়ে এখনও অমাবস্যার শেষে প্রতিপদ তিথিতে ব্যবসার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, বাটখারা ইত্যাদি পূজা করা হয়। এই পরিবারের কালীপূজা হয় কালিকাপুরাণ মতে। দক্ষিণাকালীর বাঁ পায়ে বিছে আঁকা হয়। তবে কালীপূজায় বলি দেওয়ার রীতি নেই এই বনেদি পরিবারে।

হাটখোলায় জগৎরাম দত্ত বাড়ির পূজা : উত্তর কলকাতায় হাটখোলা অঞ্চলের দত্তরা একটি সুপ্রাচীন পরিবার। 'বালির দত্ত' হিসেবে পরিচিত আন্দুল দত্তচৌধুরী পরিবারের বংশধর রামচন্দ্র দত্ত চিৎপুর-হাটখোলা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন আঠারো শতকের শেষার্ধে। তাঁর পৌত্র জগৎরাম দত্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাটনা ওয়্যার হাউসের আমদানি-রপ্তানি বিভাগের দেওয়ানি করে বহু অর্থ উপার্জন করেন। তিনি পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে প্রায় সাত বিঘা জমির ওপরে এক প্রাসাদোপম সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। দু'দালানের পাঁচ খিলান যুক্ত ঠাকুরদালানের পত্রাকৃতি বিন্যাসের ভগ্ন খিলানগুলি আঠারো শতকের কলকাতার ধর্মীয় স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে। বর্তমান সময়ে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তা জরাজীর্ণ। এই পরিবারের প্রাণপুরুষ জগৎরাম দত্ত হাটখোলা দত্তবাড়িতে সূচনা করেছিলেন দুর্গাপূজা এবং কালীপূজারও। এখানেও দক্ষিণাকালীর মূর্তিতে দেবীর আরাধনা করা হয়।

আন্দুল দত্তচৌধুরী পরিবারের মূল কালীপূজা : এই পরিবারের জগৎরাম দত্ত নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করে আলাদা কালীপূজা ও দুর্গাপূজার প্রচলন করলেও আন্দুলের দত্তচৌধুরি পরিবারের কলকাতায় স্থাপিত রামচন্দ্র দত্তের মূল কালীপূজা ও দুর্গাপূজা বর্তমান মদনমোহন দত্ত লেনের রামচন্দ্রের সাবেক বসতবাটী ও ঠাকুরদালানেই সম্পন্ন হয়। এই পরিবারের উত্তরসূরি মদনমোহন দত্ত, যাঁর নামে রাস্তাটি। প্রাসাদোপম ওই বাড়িতে দুর্গাপূজা ছাড়াও কালীপূজাতে আড়ম্বর ও জাঁকজমক সহকারে পূজা করতেন। মদনমোহন দত্ত লেনের এই ঠাকুরদালানও তিন খিলান ও দু'দালান বিশিষ্ট। এই মদনমোহন দত্তের ব্যবসাতেই প্রথম চাকরি করতেন রামদুলাল সরকার। এই দত্ত বাড়ির সদস্যেরা বাড়ির সামনে বিশাল আটচালা মন্দির-সহ দুর্গেশ্বর নামে এক বিশালাকৃতি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ওই কালো পাথরের তৈরি শিবলিঙ্গ কলকাতার অন্যতম বৃহৎ শিবলিঙ্গগুলোর অন্যতম। এখন বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে ঘোষ পরিবারের হাতে। ঠাকুরদালান রক্ষণাবেক্ষণ হলেও দায়িত্বহীন সংস্কারের ফলে পুরোনো দালানের প্রাচীন অলংকরণের বেশিরভাগই এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পূজা যদিও আজও বজায় রেখেছেন পবিারের উত্তরপ্রজন্ম। ডাকের সাজের দক্ষিণাকালী মূর্তিতে পূজা হয় এখানেও।

সিমলার রামদুলাল সরকারের পূজা : মদনমোহন দত্ত লেনের আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবারের সূত্রে রামদুলাল দে-সরকারের নাম এসেছে। জাহাজ-ব্যবসায়ী রামদুলাল দে-সরকারই এই পরিবারের স্থপতি। ২৪-পরগনার রেকজোয়ানি গ্রামে ছিল তাঁর পৈতৃক বাড়ি। ছোটোবেলায় ঠাকুমার হাত ধরে কলকাতায় এসে দত্তবাড়ির কর্তা পূর্বোক্ত মদনমোহন দত্তের জাহাজ ব্যবসায়ে চাকরি নেন। মালিকের বিপুল বিত্ত কুড়িয়ে পেয়েও নিঃসংকোচে তা ফিরিয়ে দেওয়ায় তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে মদনমোহন দত্ত তাঁকে নিজে ব্যবসা করার পরামর্শ দেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যে কয়েকজনের চেষ্টায় বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে আমেরিকার বহির্বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, রামদুলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীন ব্যবসায়ী রামদুলাল অতুল বৈভবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিডন স্ট্রিটের (অধুনা অভেদানন্দ রোড) নিজ বসতবাটিতে দুর্গাপূজার সঙ্গে কালীপূজাও আরম্ভ করেন। পূজাটি তাঁর দুই ছেলে ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর আমল থেকে জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। দক্ষিণাকালীর পূজা হয় এই বাড়িতে।

চক্রবেড়িয়া মিত্রবাড়ি : এই পরিবারের প্রাণপুরুষ রামগোবিন্দ মিত্র ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার দেওয়ান। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজে হার হলে আরও অনেকের সঙ্গে রামগোবিন্দ নতুন কেল্লা (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম) তৈরির জন্য কলকাতার সাবেক গোবিন্দপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় কলকাতারই বিভিন্ন অঞ্চলে। ভবানীপুর অঞ্চলে পুনর্বাসন পেয়ে রামগোবিন্দ ঠাকুরদালান-সহ বসতবাটী তৈরি করে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা আরম্ভ করেন আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। শরিকি বিভাজনের কারণে পুরোনো মিত্রবাড়ির প্রাচীন বসতবাটী এখন বহু ভাগে বিভক্ত। পাঁচ খিলানযুক্ত বিশাল ঠাকুরদালানটিও এখন আগের অবস্থায় নেই। পাঁচটি খিলানের চারটিই ভেঙে গিয়েছে। পূজা হয় অবশিষ্ট একটি খিলানের মধ্যে। এখানেও ডাকের সাজের দক্ষিণাকালীর মূর্তিই পূজিত হন।

বাঙ্গালি নাকি বিদেশ বিভুঁই যেখানেই যায় আর কিছু করুক না করুক একটা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করবেই। কলকাতায় ফাটাকেষ্ট, সোমেন মিত্র কিংবা পাথুরিয়াঘাটার বারোয়ারি কালীপূজা ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলেও কলকাতার বনেদি বাড়ির ইতিহাসে কালীপূজার চল সেভাবে দেখা যায় না। তবে দুর্গাপূজার হাত ধরে বনেদি বাড়িতে কালীপূজার প্রচলন হয়েছে। সেরকম কিছু কালীপূজার সন্ধান থাকলো এবারের প্রতিবেদনে। □

হিন্দু বিতাড়ন, হিন্দু মন্দির ও মূর্তি ভাঙা কেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াল?

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

দশ লক্ষ লোকের প্রাণ আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ ভৌগোলিক ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বিশ্ব দরবারে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রথম ভুটান এবং তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে। তারপর ১৫০টি দেশ সে স্বীকৃতির তালিকাভুক্ত হয়। দেশটি যে সকল মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাতে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' ছিল অন্যতম। দেশটি স্বাধীনতা লাভের পরে মূল বিষয় থেকে কতটুকু সরেছে তা আলোচনার জন্য এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন গ্রন্থ। এটি একটি লিখিত দলিল। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং ওই বছরেই ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়। এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বিদ্যমান। তবে ইংরেজি ও বাংলার মধ্যে অর্থগত বিরোধ দৃশ্যমান হলে বাংলা রূপ অনুসরণীয় হবে বলে সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান কেবল বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনই নয়, সংবিধানে বাংলাদেশ নামক দেশের মূল চরিত্র বর্ণিত রয়েছে। এতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা-সহ যাবতীয় বিষয় সমূহের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছিল, দেশটি হবে প্রজাতান্ত্রিক, গণতন্ত্র হবে এদেশের প্রশাসনিক ভিত্তি, জনগণ হবে সকল ক্ষমতার উৎস এবং বিচার বিভাগ হবে স্বাধীন। জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস হলেও দেশ আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। সংবিধানে জাতীয়তাবোধ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে শাসন পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে যেসব অনুষঙ্গ ক্রিয়াশীল ছিল তার মধ্যে প্রধান ও অন্যতম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা যা বর্তমান সময়ে স্বাধীন দেশটিতে হঠাৎ অদৃশ্য কারণে ইসলামি ভাবধারার পুনরুত্থান ঘটেছে। ফলে, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থাপনা--- এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে সার্বভৌম দেশ হিসেবে যে বাংলাদেশের জন্ম সেটি হয়ে উঠলো বিতর্কিত।

এক সময় দেখা গেল শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা বিরোধীরা ধীরে ধীরে মাটি কামড়ে ধরে নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল। ইসলামি মোল্লাবাদীরা সেই ষড়যন্ত্রের হোতা হয়ে উঠলো প্রকাশ্যে। সংবিধানে ইসলাম শব্দটি কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত করা যায় কিনা সে নিয়ে মাথাব্যথা হয়ে উঠলো অনেকের। সংবিধান সংশোধনের নানারকম তাগিদ শুরু করলো একটি বিশেষ মহল। তারা সফলতা অর্জনও করলো বটে। সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী জাতীয় সংসদে আনা হলো ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান-সহ সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির-রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হলো। সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমানের উত্থাপিত বিলটি ২৪১-০ ভোটে পাশ হয় সেদিন। সেদিনই দেশটি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রথম সিঁড়ির ভিত্তি স্থাপন করে। আজ যা একটা পরিপূর্ণ অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে।

> **যে অনুভূতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেটি বেমালুম ভুলে যাওয়ার ফলে দেশটির স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি হয়নি।**

পরে সংশোধনীটি উচ্চ আদালতের রায়ে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবৈধ ঘোষিত হয়ে গেলেও কুচক্রীরা থেমে থাকেনি। তারা বিভিন্ন কৌশল জারি রেখে ফাঁকফোকর খুঁজতে শুরু করলো। তাতে সফল হলো। সংসদে আনা হলো অষ্টম সংশোধনী বিল। রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৮ সালে সরকারি ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান করলেন। তিনিই ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলে আবারও কুঠারাঘাত করলেন বন্দুকের জোরে। ইসলামি মোল্লাবাদীরা খুশি হয়ে গেলেন। এইবার আর বিরাম কীসের! এগোতে থাকলো ইসলামি শাসন কায়েমের স্বপ্নে।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিটি ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে সরিয়ে ফেলেন পরে যা পুনঃস্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ 'পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর' দ্বারা এবং

ফঃ ২

১৯৮৮ সালে ইসলামকে সরকারি ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে। এই সময়ে সামরিক সরকার তার বিদেশি দোসরদের সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর কথা ভাবলেন না। তারা মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষের অনুভূতিকে চরমভাবে অপমানিত করলেন। ২০১০ সালে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ আদালত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের একটি মূল মতবাদ হিসেবে পুনঃস্থাপন করে। সরকার কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না— এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনোরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোনো ধর্মকে কোনো প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না। কিন্তু সেটা পরবর্তীতে হয়ে উঠে প্রতীকী অনুসংশোধনীর মতো। বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর দেশটির সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় 'অনৈসলামিক' আখ্যা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে মানুষকে কৌশলে সরিয়ে আনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ইতিবাচক বিস্তৃতি এবং জনমনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল তাকে বাধাগ্রস্ত ও কোণঠাসা করে দেওয়া হলো।

এখন এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে ইসলামীকরণ উত্থান এবং ধর্মনিরপেক্ষকরণে সৃষ্ট বাধার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় ক্রিয়াশীল। সামরিক শাসকরা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করেছে, যেমনটা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা শুধুমাত্র ভোটের জন্য। নিজের স্বার্থের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানও ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের আনুগত্যকে কাজে লাগিয়েছে। অতি বিশ্বাস এবং ইসলাম সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞানের কারণে মানুষ অজ্ঞানতাকে আঁকড়ে ধরেছে। এতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা। যার কারণে রাতারাতি ইসলাম শব্দভিত্তিক ব্যাংক, বিমা, স্কুল, কলেজ-সহ যাবতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। বলতে গেলে সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলো দেশটির অর্থনীতি ও রাজনীতি-সহ সামাজিক পরিচালন শক্তি।

স্বাধীন দেশে যে সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়েছিল তাতে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং সব ধরনের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সরকারিভাবে। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর। তাঁর হত্যার পর দেশে দীর্ঘ সময় সামরিক শাসন কায়েম ছিল। সে সময়ে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের হাত ধরে ইসলামি ভাবধারার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনাচরণে। তবে ইসলামকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে মোল্লাবাদের যে উত্থান বাংলাদেশে ঘটেছে, তার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠায় সবসময়ই সচেষ্ট আওয়ামি লিগ সরকার থাকলেও মোল্লাবাদীদের কারণে সেটা বাস্তবায়ন বর্তমানে একদম অসম্ভবই। নানা পরিবর্তন পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে এই সময়ে এসে বাংলাদেশের সংবিধানে যে বৈপরীত্য লক্ষণীয়, সেখানে ইসলামের মুখোমুখি করে দেওয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে। ফলে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ যে চরিত্র ছিল তার অনেকটাই আজ ক্ষুণ্ণ ও বিপন্ন। দুর্বল শাসন ব্যবস্থা এবং জনবর্জিত সরকারের কারণে কোটি কোটি মানুষের মনে ও ভাবধারায় আঘাত দেওয়া হয়েছে। ফলে সংখ্যালঘু তকমা লাগিয়ে আগামী দিনগুলিও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, মূলধারার রাজনীতিতে ইসলামের কোনও প্রাধান্য ছাড়াই বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার অন্তরায় কোথায়? কোনও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নয়, বরং প্রতিটি ধর্মকে যার যার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব হিসেবে বিবেচনা এবং ধর্মীয় আচার- ব্যবহারকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের চরিত্র। কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সরকারি কোনো কর্মসূচিতে কোরান থেকে তেলাওয়াত করা হলেও আর কোনো ধর্মের কোনো গ্রন্থ থেকে কোনো পাঠ করা হয় না। তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষতা শুধুই কি মুখে মুখে? আসলে হলোও তাই।

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার বাধাসমূহ নিরূপণের জন্য এই ভূখণ্ডের রাজনীতিতে ইসলামি ভাবধারার পুনরুত্থান এবং সে কারণে দেশ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, তা অতিক্রমের পথ খুঁজে বের করা এখন অত্যাবশ্যক বলেই প্রতীয়মান। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? সবই হচ্ছে ভোট আর ক্ষমতায় থাকার জন্য। ইসলাম ছাড়া বাদবাকি ধর্মকে উপেক্ষা করলে কারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। অমুসলমানদের উপর সমস্ত সরকারের আমলেই চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে। এখনো হচ্ছে অনেকটা প্রকাশ্যেই। হিন্দুদের মন্দির ও মূর্তি ভাঙা আজকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু সম্পত্তি দখল করা একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে।

এ দেশের সমাজব্যবস্থার সর্বত্র ইসলামি ভাবধারার ব্যাপক পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে জঙ্গি জুলুমবাজ, উপনিবেশবাদের ছায়া ও অস্তিত্ব আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উপনিবেশ-উত্তর তত্ত্ব অনুসারে, ঔপনিবেশিক শাসকদের থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরও উপনিবেশ-উত্তর সাম্রাজ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব অব্যাহত থেকে যায়। এ বিষয়ে সমাজ-বিশ্লেষক ও তাত্ত্বিক ফ্রানৎস ফেননের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ঔপনিবেশিক শাসনকালে যে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে ওঠে, তারা উপনিবেশ-উত্তর সমাজে অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ হিসেবে ফেনন বলেন, এই দুই শ্রেণী তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজ ভূমিতে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ-নিপীড়ন করার পাশাপাশি দুর্নীতির ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। বাংলাদেশে বাঙ্গালির হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ উৎসব 'পহেলা বৈশাক' পালন নিয়ে চরম অশান্তি এবং বিরোধিতা আজকে স্পষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা-সহ সব ধরনের সাহিত্যকর্মের প্রচার নিষিদ্ধ করারও পাঁয়তারা চলছে গোপনে গোপনে।

একটা কথা ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য, যে অনুভূতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেটি বেমালুম ভুলে যাওয়ার ফলে দেশটির স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি হয়নি। □

বর্তমানে তিব্বতে বসবাসকারী তিব্বতীয়রা মুক্ত তিব্বতের সরকার পরিচালনা করবে, নির্বাসিত প্রশাসনের সদস্যরা নয়। তিনি বলেছিলেন যে তিব্বতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে যার নেতৃত্বে একজন অন্তর্বর্তী- রাষ্ট্রপতি হবেন। এই অন্তর্বর্তী-রাষ্ট্রপতির কাছে পরম পবিত্রতা তার সমস্ত সাময়িক ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

তিব্বত তার হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে উন্মুখ

সাধন কুমার পাল

স্কুলে পড়ার সময় ইতিহাস পড়ার সুবাদে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় তিব্বতীয়দের নির্বাসিত সরকার সম্পর্কে জেনেছিলাম। তখন থেকে এই নির্বাসিত সরকার সম্পর্কে কিছু কৌতূহল মনে দানা বেঁধে ছিল। নির্বাসিত সরকার মানে কী? ওরা কি চারদিকে ঘেরা কোনো জায়গায় থাকে? ওরা কি তাঁবুতে বসবাস করে? তখন তো আর ইন্টারনেট বা মোবাইল ছিল না, স্বাভাবিকভাবেই ছেলেবেলায় এরকম নানারকম কাল্পনিক কিছু ছবি মনে ভেসে উঠতো। ছেলেবেলার সেই সমস্ত ভাবনা, সেই সমস্ত কৌতূহল যে পরিণত বয়সেও মনের মণিকোঠায় ঘুমিয়ে থাকে এবং সময় সুযোগ পেলে যে সেগুলি আবার জেগে ওঠে তা এবার প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম।

উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সালে গণচীনের বিরুদ্ধে তিব্বতীয়দের স্বাধিকারের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তখন দলাই লামার নেতৃত্বে অসংখ্য তিব্বতী ভারত সরকারের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় বসবাস আরম্ভ করেন। সেখানেই ভূতপূর্ব স্বাধীন তিব্বতের নির্বাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দু'দিন ব্যাপী একটি সর্বভারতীয় বৈঠকে যোগ দিতে ১ সেপ্টেম্বর বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি অমৃতসর পৌঁছাই। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ ও আট্টারি বর্ডার দর্শনের অনুভব পৃথক কোনো লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার ইচ্ছে থাকলো।

অমৃতসর থেকে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালার দূরত্ব ২০০ কিলোমিটারেরও একটু বেশি। ব্যক্তিগত গাড়িতে যেতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা, কখনো কখনো ছ' ঘণ্টাও সময় লেগে যায়। হিমাচল প্রদেশে সাম্প্রতিক বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে কুলু, মানালি, সিমলা এই সমস্ত জায়গার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। ওখানে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনই অতিষ্ঠ। সুতরাং পর্যটকদের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এরকম পরিস্থিতিতে অমৃতসর থেকে যখন আমরা ধর্মশালা যাওয়ার পরিকল্পনা করছি তখন প্রায় সবাই বললেন ওখানটায় যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। রাস্তাঘাট ঠিক নেই যখন তখন ল্যান্ড স্লাইড হচ্ছে ইত্যাদি। বৈঠক স্থলে যিনি যোগাযোগ প্রমুখ ছিলেন তিনি অভয় দেওয়াতে আমরা ৪ সেপ্টেম্বর বিকালবেলা বেরিয়ে রাত্রি বারোটার সময় ধর্মশালা সার্কিট হাউসে পৌঁছাই। আগে থেকেই স্থানীয় কার্যকর্তারা আমাদের জন্য সার্কিট হাউসে একটা ঘর বুক করে রেখেছিলেন। পরের দিন সকালবেলা স্নান জলযোগ করে আমরা বেরিয়ে পড়ি ধর্মশালার ম্যাকলিওডগঞ্জে অবস্থিত তিব্বতীয়দের নির্বাসিত সরকার দেখার উদ্দেশ্যে। ম্যাকলিওডগঞ্জে পৌঁছানোর আগেই আমরা ধর্মশালার ভাগসু নাগ জলপ্রপাত দেখে নিই। জলপ্রপাত বলতে একটা ছোটোখাটো ঝরনা মাত্র। আমরা যারা দার্জিলিং কালিম্পঙে গেছি, তাদের কাছে এটা একটা সরু ঝোরা মাত্র। দেখে মন ভরবে না।

প্রথমেই আমরা দলাই লামার মূল মন্দিরে পৌঁছাই। ৫ সেপ্টেম্বর ওখানে প্রচুর ভিড় ছিল। কারণ ওই সময়টা ছিল বড়ো উৎসবের সময়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তিব্বতীয় মানুষেরা সমবেত হয়েছিলেন। সেখানেই কথা হলো নির্বাসিত তিব্বত সরকারের ডেপুটি স্পিকার Gyari Dolma-র ব্যক্তিগত সচিব Kunsang Lahamo-র সঙ্গে। শ্রীমতী Lahamo আমাদের মন্দিরের খুঁটিনাটি দেখালেন। মন্দিরের পাশেই দলাই লামার আবাসস্থল। কড়া নিরাপত্তার মোড়কে ঘেরা সেই আবাসস্থল। দলাই লামার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের আবেদন আগে থেকেই করা ছিল। কিন্তু সেদিন আমাদের পৌঁছানোর একটু আগেই তিনি মন্দির থেকে তাঁর আবাসস্থলে চলে গিয়েছিলেন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যস্ততা থাকার জন্য তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা না করেই ফিরতে হয়।

মন্দির থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার নীচে নির্বাসিত তিব্বত সরকারের প্রশাসনিক ভবনগুলি অবস্থিত। প্রথমে আমরা স্পিকারের অফিসে গেলাম, সেখানে সাদা চাদর দিয়ে আমাদের সম্মানিত করা হলো। ওখানে চা পানের পর আমরা এক এক করে নির্বাসিত সরকারের সংসদ স্থানগুলি ঘুরে দেখি। গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুখে তিব্বতীয়দের নির্বাসিত হওয়ার করুণ কাহিনি শুনছিলাম। ওদের অনেকেই ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে নিয়েছে। আবার ভালো সংখ্যক যাঁরা এখনো ভারতে নাগরিকত্ব নেননি

তাঁরা শরণার্থী হিসেবেই রয়ে গেছেন। এমন অনেকের কথা শুনলাম যারা ১৯৫০ সালে চীনা আক্রমণের সময় প্রাণ বাঁচাতে শিশু বয়সে অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে তিব্বত ছেড়ে এই হিমাচল প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে। চীন সরকারের বর্বর নীতির জন্য ওরা আর কোনোদিনই নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি। কত পরিবার এরকম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। ভারত বিভাজনের সময় শরণার্থীরা এসে আশ্রয় নিলেও পরবর্তীকালে পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছে। এখনো সেই সুযোগ রয়েছে। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। কঠোর চীনা বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাইরের কেউ কখনো তিব্বতে গিয়ে নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না।

মিউজিয়াম দেখতে দেখতে একটি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম সেখানটা কতগুলো কার্ড রাখা আছে এক একটা কার্ড একেকজন আত্মোৎসর্গকারী তিব্বতীয়দের পরিচয় উল্লেখ রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৫২ জন তিব্বতীয় চীনা ড্রাগনের কবল থেকে তিব্বতের মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আত্মাহুতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ওদের দুর্দশার করুণ কাহিনি শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

তবে ওদের চোখের স্বপ্ন দেখে, ওদের ঐতিহ্য ধরে রাখার আকুতি দেখে মনে হচ্ছিল যে একদিন ওরা ওদের তিব্বত ফিরে পাবে। কারণ নতুন প্রজন্মের কাছে সেই দুর্দশার কাহিনি এখনো যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে তা সেই ইজরায়েলিদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যারা হাজার বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে অবশেষে দেশ ফিরে পেয়েছিল। পাশাপাশি মনে পড়ছিল উদ্বাস্তু বাঙ্গালি হিন্দুদের কথা যারা তাদের দুর্দশার কাহিনি মনে রাখতেই চায় না। যারা অত্যাচারিত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে তাদের তারা নিজেরা যেমন সেই অত্যাচারিত হওয়ার কাহিনি স্মরণ করতে চায় না তেমনি পরবর্তী প্রজন্মকে সেই অত্যাচারের কাহিনি জানাতে তাদের মধ্যে প্রবল অনীহা দেখা যায়।

পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একই রকম। দেশভাগের সময় পঞ্জাবের অর্ধেক যখন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন সেখানেও যে অত্যাচার হয়েছিল তা এক কথায় ভয়ংকর। পঞ্জাবের মানুষও এখন আর সেসব মনে করতে চায় না। পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবের অত্যাচারিত হাজার হাজার পরিবার যদি সেই অত্যাচার স্মরণে রাখত তাহলে হয়তো এই প্রদেশগুলোতে কখনোই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারতো না। কারণ দেশ স্বাধীন করার কৃতিত্বের দাবিদার কংগ্রেস হলে দেশ ভাগের ফলে ঘটে যাওয়া নরহত্যা ও ভয়ংকর অত্যাচারের দায়ও কংগ্রেসকেই নিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাব এই দুটি রাজ্যেই কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকেছে দীর্ঘদিন। সেজন্য মনে হচ্ছিল তিব্বতীয়রা বেঁচে থাকবে, ওরা হয়তো দেশও ফিরে পাবে, কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালি নামক জনগোষ্ঠী হয়তো একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ হিন্দু বাঙ্গালিরা ইতিহাস থেকে সামান্যতম শিক্ষা নেয়নি।

ভারত তিব্বতের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, এমনকী একটি স্বাধীন সরকার চালানোর অনুমতি দিয়েছে। দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ যে কত মহান, সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল তার প্রত্যক্ষ অনুভব দিতে গেলে যেতে হবে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা নির্বাচিত তিব্বত সরকারের কর্মভূমিতে।

আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের গায়ে 'লেফট লিবারেল' নামে একটা ট্যাগ ঝোলানো হয়। কিন্তু কমিউনিস্টরা যে লিবারেল নয় বরং উন্মাদ জেহাদিদের চেয়েও অসহিষ্ণু তার বড়ো প্রমাণ চীনের তিব্বত নীতি। তিব্বত দখলের পর তিব্বতীয়দের মন থেকে তিব্বতের পৃথক অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য চীন তিনটে কাজ করেছে। চীনা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তিব্বতের জনচরিত্র পালটে দেওয়া হয়েছে, তিব্বতীয় চিন্তাশীল মানুষদের হত্যা করা হয়েছে অথবা ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে, তিব্বতের মঠ, মন্দির, স্কুল কলেজ লাইব্রেরি সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে তাদের চীনের স্কুল কলেজে চীনের ভাষায় পড়তে সেই সঙ্গে চীনের সংস্কৃতি চর্চায় বাধ্য করেছে। ফলে তিব্বতের নতুন প্রজন্ম এখন নিজেদের চীনা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

তিব্বতের মাটিতে বসবাসকারী বর্তমান প্রজন্মের তিব্বতীয়দের এই মানসিক পরিবর্তন যে তিব্বতকে চীনের কবল থেকে মুক্ত করার পথে বড়ো বাধা তা দলাই লামার সাম্প্রতিক মন্তব্য থেকে স্পষ্ট। অতি সম্প্রতি দলাই লামা বলেছেন, 'আমরা স্বাধীনতা চাইছি না। বহু বছর ধরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা চীনের অংশ। এখন চীনের বদল হচ্ছে। ঘরোয়া ভাবে হোক বা আনুষ্ঠানিক ভাবে— চীন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। কারও উপর আমার রাগ নেই। তিব্বতের প্রতি চীনের যে নেতারা এতটা খারাপ ব্যবহার করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমাদের রাগ নেই। চীন ঐতিহাসিক ভাবেই বৌদ্ধদের দেশ। আমি সেই দেশে গিয়ে এটা বুঝতে পেরেছিলাম।' সেই সঙ্গে বলেছেন, 'তিব্বতীয়দের যে সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবধারা রয়েছে, তাতে গোটা বিশ্বের উপকার হবে। আমি সমস্ত ধর্মকেই সম্মান করি। কারণ, তারা তাদের অনুগামীদের ভালোবাসা ও ক্ষমা করতে শেখায়। আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে ১০০ বছরের বেশি বাঁচতে চাই। আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমার দীর্ঘ জীবনের জন্য আপনারা প্রার্থনা করুন।'

নির্বাসিত তিব্বত সরকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৪৯ সালে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি তিব্বতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ খাম এবং আমদোতে অগ্রসর হয়, পরের বছরে পূর্ব তিব্বতের সদর দপ্তর চামদো দখল করে। তারপরে ১৯৫১ সালে তথাকথিত 'তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তির জন্য ১৭ দফা চুক্তি' তিব্বত সরকার এবং তিব্বতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে চীনা সেনাবাহিনী আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয় এবং অবশেষে ১৯৫৯ সালে লাসার জাতীয় বিদ্রোহকে চূর্ণ করে। এর ফলে মহামহিম দলাই লামা এবং প্রায় ৮০ হাজার তিব্বতীয় ভারত, নেপাল ও ভুটানে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তিব্বতীয় উদ্বাস্তুদের আগমন আজও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে, তিব্বতের নির্বাসিত জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি, যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ভারতে অবস্থিত।

২৯ এপ্রিল ১৯৫৯-এ মহামান্য দলাই লামা উত্তর ভারতীয় হিল স্টেশন মুসৌরিতে

ধর্মশালায় নির্বাসিত তিব্বত সরকারের সংসদকক্ষ

তিব্বতীয় নির্বাসিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মহামহিম দলাই লামার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় তিব্বত প্রশাসন (সিটিএ) নামকরণ করা হয়েছে, এটি স্বাধীন তিব্বতের সরকারের ধারাবাহিকতা। ১৯৬০ সালের মে মাসে সিটিএ ধর্মশালায় স্থানান্তরিত হয়। তিব্বতে ও তিব্বতের বাইরের তিব্বতীয় জনগণ তাদের একমাত্র এবং বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে সিটিএ-কে দেখে। সিটিএ এবং প্রশাসনের সত্য, অহিংসা এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারের অলঙ্ঘনীয় নীতির অর্থ হলো এটি এখন তিব্বতের জনগণের বৈধ এবং প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে সারা বিশ্বের পার্লামেন্ট এবং সাধারণ জনগণ দ্বারা ক্রমবর্ধিত ভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। প্রবাসী বহু তিব্বতীয় এই অঞ্চলকে গণচীনের একটি অংশ হিসেবে মানতে সম্মত নন। ১৯৫৯ সালে গণচীনের বিরুদ্ধে তিব্বতীয়দের স্বাধিকারের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তখন দলাই লামার নেতৃত্বে অসংখ্য তিব্বতীয় ভারত সরকারের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় বসবাস আরম্ভ করেন। সেখানেই ভূতপূর্ব স্বাধীন তিব্বতের নির্বাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতের রাজধানীর নাম লাসা।

তার সূচনা থেকেই, সিটিএ নিজেকে তিব্বতের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং তাঁদের স্বাধীনতা ও সুখী জীবনযাত্রা বহাল রাখার দ্বিবিধ কর্মসূচি নির্ধারণ করেছে। পুনর্বাসন অ্যাজেন্ডায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে : (ক) নির্বাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার; (খ) গণতন্ত্রের একটি দৃঢ় সংস্কৃতি গড়ে তোলা; এবং (গ) আত্মনির্ভরশীলতার পথ প্রশস্ত করা যাতে তিব্বতের জনগণ আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে যা বহিরাগত সহায়তার উপর নির্ভর না করে পরিচালিত হতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র নিয়ে সিটিএ-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা আসলে যখন সেখানে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা হবে সে সময়ের তিব্বতের পুনর্গঠনের প্রস্তুতি। এই অনুশীলনের অংশ হিসেবে, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০-এ একটি সংসদ, যার নাম ছিল Commission of Tibetan People's Deputies প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পার্লামেন্টটি ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, এই ভাবে এটি Assembly of Tibetan People's Deputies (ATPD) নামে পরিচিত হয়। তারপর ২০০৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে টিবেটান পার্লামেন্ট-ইন-এক্সাইল (TPIE) করা হয়।

১৯৯০ সালে মহামহিম দলাই লামা আরও গণতন্ত্রীকরণের ঘোষণা করেন, যার মাধ্যমে নির্বাসিত তিব্বতীয় সংসদের গঠন ৪৬ সদস্যে উন্নীত হয়। সংসদকে কাশাগ বা মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে, তিব্বতি বিচার বিভাগ, তিব্বত সুপ্রিম জাস্টিস কমিশন নামে পরিচিত, দ্য চার্টার অব দ্য টিবেটানস্ ইন এক্সাইলের ৬২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাসিত তিব্বতীয় সংসদ The Charter of the Tibetans in Exile -এর অধীনে পরিচালিত।

আজ, সিটিএ-তে একটি মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসনের সমস্ত বিভাগ এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, সিটিএ তিব্বতে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য গঠন করা হয়নি। ভবিষ্যৎ তিব্বতের জন্য তার ইশতেহারে, ভবিষ্যৎ তিব্বতের রাজনীতি এবং এর সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নির্দেশিকা শিরোনামে, মহামান্য দলাই লামা বলেছিলেন যে তিব্বতে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান নির্বাসিত প্রশাসন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বর্তমানে তিব্বতে বসবাসকারী তিব্বতীয়রা মুক্ত তিব্বতের সরকার পরিচালনা করবে, নির্বাসিত প্রশাসনের সদস্যদের দ্বারা নয়। তিনি বলেছিলেন যে তিব্বতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে যার নেতৃত্বে একজন অন্তর্বর্তী-রাষ্ট্রপতি হবেন। এই অন্তর্বর্তী-রাষ্ট্রপতির কাছে পরম পবিত্রতা তার সমস্ত সাময়িক ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। অন্তর্বর্তী-রাষ্ট্রপতি, তার পালাক্রমে, দুই বছরের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচন করতে হবে এবং তারপরে জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। □

সন্ত্রাসবাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখানো কখনও কাম্য নয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য দাবি জানান। তার প্রেক্ষিতে সেখানে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করা হয়। সেই ভোটে যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ভোট পড়ে ১২০টি, বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৪টি এবং ভোটদানে বিরত থাকে ৪৫টি দেশ। ভোটদানে বিরত থাকে যে দেশগুলো তাদের মধ্যে রয়েছে— ভারত, আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান-সহ আরও ৪০টি, মোট ৪৫টি দেশ।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে তাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষ যখন আনন্দে মগ্ন, ঠিক সেই সময় অতর্কিত হামলা চালায় হামাস। হামাস একটি প্যালেস্তিনি ইসলামি সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠী, যারা গাজা উপত্যকা শাসন করে। তারা হঠাৎ যেভাবে মানুষের বসতি লক্ষ্য করে হাজার হাজার রকেট নিক্ষেপ করেছে তা এক কথায় অমানবিক। হামাসের সশস্ত্র জঙ্গিরা গাজা-ইজরায়েল সীমান্তের তারের বেড়া বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়ে পার হয়ে ইজরায়েলি বসতির বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যালীলা শুরু করে।

হামাসের হামলার তীব্রতার বিহ্বলতার রেশ কাটিয়ে উঠে ইজরায়েল প্রবল বিক্রমে হামাসের ওপর প্রতি আক্রমণ শুরু করে। প্রতি আক্রমণের ফলে গাজা ভূখণ্ডের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামাসকে সামরিক যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে এবং কোনো কোনো দেশ যুদ্ধাস্ত্র পাঠিয়েও দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে হামাস জঙ্গিরা গাজায় মাটির অনেক গভীরে মাকড়সার জালের মতো করে সুড়ঙ্গ তৈরি করে তার মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র এবং রসদাদি মজুত করে সেখান থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও ইজরায়েলের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে হামাস জঙ্গিগোষ্ঠী এখন কার্যত অসহায় অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে বিশ্বের ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে এবং তারা সকলে মিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে দরবার করার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘও যুদ্ধ বন্ধের জন্য ভোটাভুটির ব্যবস্থা করলে গরিষ্ঠাংশের মতামত যায় যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে।

কিন্তু যেটি আশ্চর্যের বিষয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুদ্ধবিরতির ভোটাভুটি হলেও সেখানে এই যুদ্ধের প্রথম হামলাকারী কে এবং কেন হামলা করা হলো তা নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে— রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো নিরপেক্ষ মঞ্চে যুদ্ধ নিয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই কী করে যুদ্ধবিরতির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আয়োজন করা হয়? প্রকৃত আক্রমণকারী কে এবং আক্রান্ত কে সেটা আগে নির্ধারণ করা উচিত ছিল। তারপর সমস্যা সমাধানের পথ বের করা উচিত।

তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুদ্ধ বিরতির আবেদনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, 'যতক্ষণ না হামাসের পুরো অস্তিত্ব ধ্বংস করবে ইজরায়েল, ততক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধ জারি থাকবে।' তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'হামাসের কাছে কোনওভাবে মাথা নত নয়। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলে জঙ্গি সংগঠনের কাছে ইজরায়েল আত্মসমর্পণ করছে বলে মনে হবে। ফলে এই যুদ্ধ চলবে।' নতুন করে গাজায় গ্রাউন্ড অ্যাটাক শুরু করার পর নেতানিয়াহু আরও বলেছেন— 'শান্তির সময় আছে, যুদ্ধেরও সময় আছে। এটা যুদ্ধের সময়। আমাদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য এই যুদ্ধ জরুরি। আজ আমরা সভ্যতা এবং বর্বর শক্তির মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছি। আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েল ও তার নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। তারাই প্রথম হামলা চালিয়েছে। আমি সমস্ত জঙ্গি ও অনুপ্রবেশকারীদের নিকেশ করার নির্দেশ দিয়েছি। বিপুল বাহিনী মোতায়েন করেছি। শত্রুদের এমন মূল্য চোকাতে হবে যা তারা কখনও কল্পনাও করতে পারবে না।' ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে হামাস বড়ো ভুল করেছে। তাদের খুঁজে খুঁজে নিকেশ করা হবে।'

ইতিমধ্যে ইজরায়েলে পা রেখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক বলেছেন, 'হামাসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে ইজরায়েলের। এ ব্যাপারে আমরা ইজরায়েলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।' একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে, গাজায় ঢুকে একের পর এক হামাসের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলের সেনা। খতম করা হচ্ছে হামাস কমাণ্ডারদের। সেনার মনোবল বাড়াতে গাজা সীমান্তে সফর করেছেন নেতানিয়াহু। হামাসের হামলার পরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা দেন। পরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোনেও জানান, খারাপ সময়ে ভারত ইজরায়েলের পাশে আছে। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভারতের এই অবস্থানে মোদীর সমালোচনায় সরব হয়েছিল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। তিনি বলেছেন, 'ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা সকলেই প্যালেস্তাইনের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। মোদীর ইজরায়েলের পক্ষ নেওয়া দুর্ভাগ্যজনক। গোটা ভূখণ্ডই প্যালেস্তাইনের, যা দখল করেছে ইজরায়েল। এলাকা, জমি, বাড়ি সব কিছু প্যালেস্তাইনের। পরবর্তীকালে ইজরায়েল কবজা করেছে। তারা বহিরাগত।'

কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসইউসিআই-কে ইজরায়েল বিরোধী স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে দেখা গিয়েছে। এতে আবার প্রমাণিত হলো ধর্মনিরপেক্ষ লেবেল সাঁটা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই ইসলামি সন্ত্রাসবাদের একান্ত অনুগত সমর্থক। ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের এই সমস্ত বজ্জাত দলগুলোর পাতা ফাঁদ থেকে দূরে থাকতে হবে। □

মাতৃপূজায় তামসিকতার অবসান ঘটাতে হবে

তরুণ কুমার পণ্ডিত

দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী পূজা, দীপান্বিতা, কালীপূজা শেষ হয়েছে, কার্তিক পূজা বাকি আছে। অতীতে আমরা দেখেছি এইসব পূজা উপলক্ষ্যে সে সময়ে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি সাধারণের মনোরঞ্জনের সব ব্যবস্থাই থাকতো। কিন্তু ওই সবকিছুই থাকতো মাতৃকেন্দ্রিক। তাই ওইগুলি মায়ের চিন্তাকে, মায়ের পূজার ভাবকে অপ্রধান না করে মায়ের চিন্তার অনুসারী হতো। বাড়িতে কোনো শ্রদ্ধেয় অথচ অতি প্রিয় পরমাত্মীয়ের আগমন হলে যে ভাব নিয়ে তাঁর সেবা-যত্ন, সাদর অভ্যর্থনা করা হতো, দেবীর আবাহন, পূজায় সেই ভাবেরই প্রাধান্য থাকতো। আবার তার সঙ্গে এই ভাবও সংযুক্ত থাকতো যে, আমাদের এই অতি প্রিয়জনটিই হলেন সেই সর্ববিধ মঙ্গলদায়িনী জগদীশ্বরী— যাঁর ইচ্ছাতেই জগতের সব কিছু ঘটে এবং বাস্তবে পরিণত হয়। তিনি সেই সর্বশক্তিময়ী জননী— যিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণসত্তাকে জাগ্রত করে দিয়েছেন, যাঁর কল্যাণস্পর্শে আমরা উন্মুখ হতে পেরেছি সত্যের সন্ধানে। তিনিই সেই মা যিনি তাঁর পীযূষধারায় সঞ্জীবিত করেছেন আমাদের অন্তরাত্মায় চৈতন্যসত্তাকে। তাই ভক্ত, সাধক এই মাকে পূজা করতেন শুধু পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়, তাঁর জীবনকে সংহত, সমৃদ্ধ অথচ সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার প্রেরণা ও শক্তিলাভ করবার উদ্দেশ্যে।

এই শারদীয়া দুর্গাপূজা আজও আমরা করছি, আগের চেয়ে অনেক বেশি করেই করছি। শহরের পাড়ায় পাড়ায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামেগঞ্জে পূজার সংখ্যা আগের চেয়ে কম তো নয়ই বরং অনেক বেশি করে পূজা হচ্ছে। তাছাড়া আছে পারিবারিক পূজা। তার সংখ্যাও কম নয়। পূজায় উৎসাহ ও জাঁকজমকের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পূজায় আগেকার দিনের সেই প্রতীক্ষা, সেই হৃদয়াবেগ, সেই ভক্তি-বিশ্বাস, সেই আনন্দ-তৃপ্তি, আমোদ আহ্লাদ এখন আর নেই। সবই আছে অথচ ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তাই পূজায় মন অধিকতর সত্যাভিমুখী হওয়া তো দূরের কথা, বিপরীতটাই যেন হচ্ছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে— কেন এমন হচ্ছে? উত্তরে বলতে হয়, আমরা উৎসব করছি ঠিকই, কিন্তু যে মাকে কেন্দ্র করে আমাদের উৎসব, সেই মা-ই তো আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। মা-কে উৎসবের আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরিয়ে রেখে মায়ের পূজাকে, তাঁর চিন্তাকে আমরা গৌণ করে ফেলেছি। তাই এই পূজা আমাদের নিকট রসহীন অপূর্ণ বলে মনে হয়। আর সেজন্যই বোধহয় তাকে সরস করতে, পূর্ণ করতে শরণাপন্ন হই আধুনিক হালকা পোশাকপরিচ্ছদ, বাহ্যিক বহু রকমের বিলাস ভূষণ এবং মদের নেশার নিকট। মদের নেশার কথা বলতে গিয়ে বিস্মিত হই,

লজ্জিত হতে হয় বাঙ্গালি হিন্দু হিসেবে। এইতো গত বছরের তথ্য বলছে, উৎসব মরশুমে মদ বিক্রিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। গত বছর ২ অক্টোবর ছিল মহাসপ্তমী।

অর্থাৎ পূজার সময়ে বিক্রির জন্য এ রাজ্যে প্রচুর খুচরো ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন মতো মদ তোলেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে অক্টোবর ৭ তারিখ পর্যন্ত একমাসে বিশাল অঙ্কের ২০৫৬ কোটি টাকার রেকর্ড মদ বিক্রি হয়েছিল যার লভ্যাংশের বেশিরভাগটাই সরকারি কোষাগারে জমা হয়। তার আগের বছর অতিমারী শেষ হওয়া মাত্রই ১২ দিনে বিক্রি হয় ৭২০ কোটি টাকার মদ। দুর্গা পূজার পাঁচ দিনে উৎসব মরশুমে মদ বিক্রিতে বাঙ্গালির কিস্তিমাত, তারা রেকর্ড টাকার মদ খেয়ে ফেললো। পশ্চিমবঙ্গে বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মদ বিক্রির পরিসংখ্যান তুলে ধরলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, এক বছরে সারা রাজ্যে মোট মদ বিক্রির পরিমাণ ২২ হাজার কোটি টাকার। আর এই টাকার মধ্যে ১৬ হাজার কোটি টাকা গিয়েছে সরকারি কোষাগারে। এর চেয়ে আর ভালো ব্যবসা কী হতে পারে? যেখানে বিনা পরিশ্রমে সরকারের কোটি কোটি টাকা লাভ হচ্ছে। তাই আজ আমাদের রাজ্য থেকে আইএএস ও আইপিএস-এর পরিবর্তে ভেজাল মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অস্ত্র কারখানা, বোমা কারখানা, বালি মাফিয়া ও নকল ডাক্তারে ভরে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবসমাজ আজ পথভ্রষ্ট, নেশার ঘোরে তারা আচ্ছন্ন, ভালো-মন্দের বিচার হারিয়ে তারা বিবেকহীন মনুষ্যত্বের জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।

একইরকম ভাবে কৃষক, শ্রমজীবী ও চাকরিজীবীদের উপার্জনের একটা বড়ো অংশ মদিরা সেবনে অপচয় হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগে সরকারি হাসপাতালের কথা না বলাই ভালো। আসলে সবমিলিয়ে জঙ্গলের রাজ্যটা এখন চলছে ভগবান ভরসায়। সরকার মাছের তেলেই মাছ ভাজতে ব্যস্ত, আর আমরা সস্তা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে মশগুল। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সরকার দুর্গাপূজা কমিটিগুলোকে ৭০ হাজার টাকা দিচ্ছে আর মদ বিক্রির করে তার দ্বিগুণ অর্থ কোষাগারে জমা করছে। শুধু কি দুর্গা পূজার মাসেই মদ বিক্রিতে রেকর্ড সৃষ্টি হয়? এবছর ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজার দিন এবং কৌশিকী অমাবস্যার রাতে কোটি কোটি টাকার মদ বিক্রির মাধ্যমে এরাজ্যের সুরাপ্রেমীরা উৎসবে মেতে উঠলেন। বাঙ্গালি যুবসমাজ, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের এই সুলভ ঢালাও মদের ব্যবহারে কতটা উপকৃত হবেন জানি না, তবে রাজ্য সরকার যে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে, এটা হলফ করে বলতে পারি। অন্য রাজ্যে যেখানে শিল্প ও কলকারখানায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে সেখানে এ রাজ্যের মানুষের ১০০ দিনের কাজে ব্যাপক পুকুর চুরি হয়, তারা কর্মহীন হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। তবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত মানুষদের একটা বড়ো অংশই যে এই মদের নেশার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইডি ও সিবিআই-এর জালে আটকা পড়ছে, এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এরাজ্যের মানুষ যে কোন্ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। তবে শুরু করেছিলাম বাঙ্গালির উৎসব ও পূজায় ভক্তি, শ্রদ্ধার বিষয় নিয়ে।

এবারে প্রতিমা গঠনের দিকে নজর দিই। মূর্তি তো তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাতে জগজ্জননীর ভাব কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পারলাম, মূর্তি ধ্যানানুগ হচ্ছে কিনা, মায়ের মূর্তি দেখে লোকের মনে জগজ্জননীর ভাব কতটা জাগ্রত হলো— সেই দিকে কারও কি কোনো লক্ষ্য আছে? আসল লক্ষ্য হলো প্রতিমা অবলম্বনে থিম কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পারলাম তার দিকে। এ যেন মায়ের প্রতিমাকে অবলম্বন করে থিমের প্রতিযোগিতা। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলতেন, প্রতিমায় মায়ের আবির্ভাব হতে গেলে তিনিটি জিনিসের দরকার,— প্রথম পূজারির ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি। বর্তমানে এই তিনটিরই অভাব চোখে পড়ছে বলে মনে হয়।

এরপর রয়েছে চাঁদার জুলুম, অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত মণ্ডপে মাইকের আওয়াজ, মাতৃসংগীতের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক চটুল গান এবং পূজায় বিশুদ্ধতার অভাব আজ চারিদিকে অবক্ষয়ের বিভীষিকা প্রকটিত করছে। এই অবক্ষয়কে বন্ধ করতে হলে জনগজ্জননীর নামে তাঁর সকল সন্তানকে এক হতে হবে। মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে; ভিন্ন মত, ভিন্ন নীতির পার্থক্য দূর করে সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধতায় সকলকে একপ্রাণ হয়ে কল্যাণের পথ অনুসরণ করতে হবে। নিজেদের হীন স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে সকলকে আত্মত্যাগ করতে হবে। তাহলেই আমরা মায়ের যোগ্য সন্তান বলে সগর্বে পরিচয় দিতে পারবো।

দুর্গা, কালী ও চণ্ডীর উপাসনা, সবই মহাশক্তির প্রকাশ মাত্র। অনির্বচনীয়া এক মহাশক্তি এই জগৎ মঞ্চে বিভিন্নভাবে অভিনয় করে চলেছেন। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুতেই একই শক্তি বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, দেবভাবের সঙ্গে অসুরভাবের অনুক্ষণ যে সংগ্রাম চলছে--- শক্তি প্রতিমা ও প্রতীকমাত্রেই তার প্রকাশ। শক্তি একাধারে এই উভয় গুণসম্পন্না। সৃষ্টি ও প্রলয়, জীবন ও মৃত্যু— একই মহাশক্তির দুটি দিক মাত্র। কার্য না থাকলে শক্তির অস্তিত্ব বোঝা যায় না। কার্য দেখেই কারণের অনুমান হয়। চণ্ডীতে বলা হয়েছে, 'আমিই জগতের ঈশ্বরী, রাষ্ট্রী; উপাসকগণের ফলদাত্রী, অতএব যজ্ঞাহগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ, সকলেই আমার উপাসনা করে থাকে'। তিনি সগুণা ও নির্গুণা, সকল জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন। শক্তি বলেছেন, আমার শক্তিতেই সকলে আহার ও দর্শন করে, জীবকুল শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকে এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করে। তাই মহাশক্তি মহামায়ার নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, আমাদের কাপুরুষতা, দুর্বলতা দূর করে আমাদের তাঁর আরাধনার যোগ্য অধিকারী করে তুলুন।

তথ্যসূত্র : *পূজাবিজ্ঞান— স্বামী প্রমোয়নন্দ।*

কোজাগরী পূর্ণিমা ও নোয়াখালী

সেই দিনটা ছিল ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল। সেদিনও ছিল লক্ষ্মীপূজা! এই বছর ২৮ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা হলো। প্রায় ৭৭ বছর অতিক্রান্ত। সেদিন চলছিল চাল, গুড়, নারকেল নাড়ু, পদ্মফুল উলু শঙ্খধ্বনি-সহ কোজাগরী সন্ধ্যেয় মা লক্ষ্মীর আরাধনা। সেইসময় জেহাদি নরপিশাচ দ্বারা নৃশংস হিন্দুনিধনের সাক্ষী হলো কোজাগরীর চাঁদ! রাস্তা হয়ে উঠেছিল হিন্দুর রক্তে লাল। রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত হিন্দুদের মৃতদেহ! বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল হিন্দুদের বাড়িঘর, গোয়াল, ধানের গোলা আর মানুষ পোড়ার বীভৎস গন্ধে। এই পুরো হিন্দু নিধনের হোতা ছিল মুসলিম লিগ। গুজব ছড়িয়ে দিয়ে কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু শূন্য করে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা হয়েছিল অনেক আগেই। বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম বীভৎস গণহত্যা এই নোয়াখালী হিন্দু গণহত্যা। গণহত্যা চলেছিল ৪ সপ্তাহ ধরে। সরকারি হিসেবে ৫ হাজারের বেশি হিন্দুকে হত্যা করা হয়। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা অন্তত কয়েকগুণ বেশি। ধর্ষিতা হয়েছিলেন হাজার হাজার হিন্দু রমণী। জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় হাজার হাজার হিন্দুকে। শুধুমাত্র কলকাতাতেই উদ্বাস্তুদের জন্য খোলা হয়েছিল ৬০টি আশ্রয় শিবির।

নোয়াখালী কোনো ভিন দেশের জায়গা নয়, ভিন জনজাতি অধ্যুষিতও নয়। নোয়াখালী তখন ছিল ভারতেরই অঙ্গ। সেখানকার অধিবাসীরাও ছিল ভারতীয়, তবু জেহাদিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হিন্দুদের উপর। প্রতিবেশীরাই অস্ত্র হাতে প্রাণ নিয়েছিল প্রতিবেশীর।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বাঁচার জন্য আজ এই ২০২৩ সালে এসেও আমাদের সেই কথা স্মরণ করতে হচ্ছে। ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর থেকে নোয়াখালীতে যে সব দানব হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল, বাড়ি ঢুকে হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল, তারা বাইরে থেকে আসেনি। তারা ছিল ওই হিন্দুদেরই প্রতিবেশী। পাশাপাশি জমিতে চাষ করত, দোকানে বেচাকেনা করত, নদীতে জাল ফেলত, হাটে যাওয়ার পথে দেখা হলে বাড়ির খবর নিত। তারা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলত, তারা সবাই নাকি 'বাঙ্গালি' ছিল! তারা একই বৃন্তের দুটি ফুল। কিন্তু হিন্দু প্রতিবেশীর বুকে ছুরি বসাতে তারা দু'বার ভাবেনি। প্রতিবেশীর কন্যা, যে তাকে 'চাচা' বলত, তাকে ধর্ষণ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি।

নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া ও সন্দ্বীপ থানা এবং ত্রিপুরা জেলার হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম খানার অধীনে সর্বমোট প্রায় ২০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলে এই তাণ্ডব। কমপক্ষে ৫০ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। হিন্দু বাড়িতে গোরু জবাই করে সকলকে খেতে বাধ্য করা হয়। প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু আক্রান্ত এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। কিছু এলাকায় হিন্দুদের স্থানীয় মুসলমান নেতাদের অনুমতি নিয়ে চলাফেরা করতে হতো। জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিতদের কাছ থেকে জোর করে লিখিত রাখা হয়েছিল যেখানে লেখা ছিল তারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাদের একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে বা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হতো এবং যখন কোনো আনুষ্ঠানিক পরিদর্শক দল পরিদর্শনে আসত তখন তাদের ওই নির্দিষ্ট বাড়িতে যাবার অনুমতি দেওয়া হতো। হিন্দুদের ওই সময় মুসলিম লিগকে চাঁদা দিতে হত যাকে বলা হতো জিজিয়া কর। যা আমাদের মধ্যে যুগের মুসলমান শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

নোয়াখালি দাঙ্গা শুধু একটি ঘটনা নয়, হিন্দুদের জন্য একটি শিক্ষাও বটে! এই নারকীয় হত্যালীলা আমরা ভুলব না, ভুলতে দেব না। যতদিন বাঁচব নিরন্তর বলে যাবো পরবর্তী প্রজন্মকে, যাতে তারাও ভুলতে না পারে।

—**কুমারেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার,**
ইংরেজ বাজার, মালদা।

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের

মণ্টুবাবু আমার প্রতিবেশী। মর্নিং ওয়ার্কের সময় আমার সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। গঙ্গার ধারে বেঞ্চে বসে একটু আলাপ আলোচনা হয়। তারপর যে যার বাড়ি ফিরে যাই। আমি মাঝে মাঝে তাকে একটা স্বস্তিকা বা ওবিসি সংবাদ পড়তে দিতাম। আমি অবশ্য কোনও দাম চাইতাম না। আর তিনিও তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। একদিন তাঁকে একটা স্বস্তিকা দিতে তিনি একটু ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'কেন এসব সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছেন বলুন তো'? আমি বললাম, 'আমি সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছি সেটা কী রকম'? তিনি বললেন, 'এই যে মুসলমানদের সব লেখালেখি করছেন এগুলো কী ঠিক হচ্ছে? আমি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনি তো বরিশালের লোক, এখন চন্দননগরে আছেন কেন? তিনি বললেন, 'দেশভাগ হয়েছিল তাই।' দেশভাগ হয়েছিল ঠিক আছে, কেন দেশভাগ হলো তাও জানতে চাইছি না। আমার প্রশ্ন আপনারা বরিশাল থেকে পালিয়ে এলেন কেন? উত্তর হলো সেখানে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার খুব বেড়ে গিয়েছিল তাই। এবার আমার প্রশ্ন হলো, যদি চন্দননগরটাও পাকিস্তান হয়ে যায় তাহলে কি আবার এখান থেকে পালাবেন? মুসলমানদের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে উর্দীবাজার, তেলেনী পাড়া, চাঁপদানী, গোন্দলপাড়া প্রভৃতি এলাকায়। হতেও তো পারে? কলকাতায় পার্কসার্কাস, বেনিয়াপুকুর, রাজাবাজার, মোমিনপুর, খিদিরপুর, মেটিয়াব্রুজ প্রভৃতি এলাকায় যেভাবে তারা সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে তাতে আশঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ হয়েছে। ২০২৪-এর নির্বাচনে কিছুটা অবশ্য আন্দাজ করা যাবে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, চন্দননগর।

ফ ঃ ৩

কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না

কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না আর হাহাকার। সেই দিনের সেই পৈশাচিক কাণ্ড সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এখন রায়দানের পর শোকের ছায়া দেখছি হাইকোর্টে। কী নিদারুণ বুকফাটা কান্না, চোখে জল আনে। ২০১৩ সালের ৭ জুন দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ পড়ুয়া কিশোরীকে কয়েক জন নরখাদক গণধর্ষণ করে খুন করেছিল। সেই বিচার চলতে চলতে এক দশক কেটে যায়। অবশেষে বিচার মেলে। তবে ওই মৃতা কিশোরীর পক্ষে নয়, বিচার পায় নরখাদক, ধর্ষণকারীরা। নিম্ন আদালত তিনজন নরখাদককে ফাঁসির সাজা এবং তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। তারপর এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হয়। আপিলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দুজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় আর চারজন ছাড়া পায়। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর এমন বিচারের আদেশ সারা রাজ্যবাসীকে স্তম্ভিত করে। ওই মৃতা কিশোরীর পরিবার দুঃখসাগরে ডুবে যায়। অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে কী ভয়ংকর হতে পারে ভেবে সেখানকার গ্রামবাসীরা ভয়ে আতঙ্কিত।

একদিকে বিলম্বিত বিচার, আইও-র রিপোর্ট, উকিল বাবুদের সওয়াল জবাব, ঘন ঘন সরকারি উকিল (১৪ জন) পরিবর্তন, ঠিক মতো সাক্ষী দিতে না পারা, একের পর এক আপিল তারা বিচার পায় না। এমন জটিল পরিস্থিতিতে বিচার পাওয়ার কথা নয়। তাই 'প্রতিকারহীন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কেঁদে চলে। যারা এমন পৈশাচিক ঘটনার জন্যে দায়ী তারা কোর্টে প্রমাণ করে নির্দোষ। আর যে নির্যাতিতা খুন হলো প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ওই খুনিদের দ্বারা ধর্ষণ বা খুন হয়নি। সে কীভাবে খুন হলো? তার আইনি ব্যাখ্যা কোর্টের কাছে নেই। এটা তো অ্যাক্ট অব গড নয়, হিনাস অ্যাক্ট অব ক্রিমিনাল আমরা সকলে তা জানি। এক কোর্টের আদেশ পক্ষে যায় আবার আপিল কোর্টের আদেশ বিপক্ষে যায় ঠিক যেন জুয়া খেলার মতো। পাশার দান কখন কার পক্ষে যায় বোঝা মুশকিল। দশ বছর আগের ঘটনা দশ বছর পরে ডকে দাঁড়িয়ে কখনো সাক্ষী দেওয়া যায়? যা অবাস্তব তা কখনো বাস্তব হয়? তবুও এই বিলম্বিত, অন্ধকার বিচার ব্যবস্থা নাকি আমাদের মুক্তির ঠিকানা? বুলডোজার বাবা যোগীর এনকাউন্টারে মুহূর্তে বিচার মেলে বলে তাই এতো প্রশংসিত। আইন তৈরি হয় মানুষের মুক্তি জন্যে। এখানে আইন আমাদেরকে মুক্তির দিশা দেখাতে পারছে না। ঔপনিবেশিক মানসিকতা, জরাজীর্ণ, সংস্কারহীন বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। মনে হয় মানুষের জন্যে আইন নয়, আইনের জন্যে মানুষ। জটিল আইনের ফাঁদে পড়ে নিরীহ, অসহায় গরিব, মূর্খ, দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। বাঙ্গালিকে এই ভাবে হাইকোর্ট দেখানো হয় আর তারা হাইকোর্ট থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি যায়। বিচার ব্যবস্থাকে কখনো সমালোচনা করা যায় না কিন্তু কখনো কখনো তারা সমালোচিত হবার কারণ হয়ে ওঠে। কামদুনি এখন খুব করে কাঁদুক, কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুশোক ভুলে যাবার চেষ্টা করুক। এখন কোর্ট থেকে সুবিচার মিলবে এখন আশা ক্ষীন মনে হয়। ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসুক ওই ধর্ষক খুনিদের ওপর— এই প্রার্থনা করি।

—সুবল সরদার,

মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মুখোশের আড়ালে

স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশ গড়ার বদলে কংগ্রেস নেতা-মন্ত্রীরা বিলাসিতা ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বার বার নির্বাচন হলেও, সরকার বদল হলেও দেশের জন্য ভাবনা কারও ছিল না। দেশের ভিতর শত্রু তৈরি হলো। জনসঙ্ঘ নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাশ্মীরের জেলে বন্দি দশায় মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির মৃত্যু, বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই এবং হোমি ভাবার মৃত্যু হয় ওই একই সময়ে। কোনো মৃত্যুর তদন্ত হয়নি। বলতে গেলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার হয়তো তদন্তের সাহস পায়নি। কারণ তখন আমাদের দেশের ভিতর বাসা বেঁধেছে বৈদেশিক শত্রুরা। তারাই কামিনীকাঞ্চন দিয়ে আমাদের দেশের প্রভাবশালী সরকারের আধিকারিক, নেতা-মন্ত্রীদের কিনে নিয়েছিল। তারাই তলে তলে দেশ বিরোধী এজেন্ট নিয়োগ করে দেশকে ভিতর ভিতর খোকলা করে দেয়। বিশেষ করে ইউপিএ-১ এবং ইউপিএ-২ এর সময় কেন্দ্রীয় সরকার নানা দলের রামধনু জোটের কারণে সরকার দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দেয়। সাহস দেখাতে পারেনি বিদেশি এজেন্টদের বিরুদ্ধে। নানাবিধ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ জড়িয়ে পড়ে মনমোহন সিংহের সরকার।

এরপর ভারতের মানুষ দেশের দায়িত্ব তুলে দেয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের হাতে। বিরোধী দল সবসময় যে সংগঠনের উপর খড়্গহস্ত তার নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সেই সঙ্ঘ বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীকে সতর্ক করে দেয়। সঙ্ঘ কোনো রাজনৈতিক দল নয়। তারা প্রতিদিন শাখার মাধ্যমে ভারত মায়ের পূজা ও দেশকে বৈভবশালী করার প্রতিজ্ঞা নেয়। তাদের সতর্কতার কারণেই দেশবিরোধী বৈদেশিক শক্তির ভীষণ অসুবিধা হয়। তাই কংগ্রেস, বাম, অতি বাম, মমতা, লালু এক সুরে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। এরাই খালিস্তানিদের সমর্থক। খালিস্তানিরা কৃষক আন্দোলনে মিশে গিয়ে লালকেল্লা থেকে দেশের পতাকা নামিয়ে খালিস্তানি পতাকা তুলে দেয়। ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে খালিস্তানি হাত রয়েছে মণিপুরের হিংসার মধ্যে। এক শ্রেণীর সাংবাদিক নিউজ ক্লিক গঠন করে বিদেশি টাকা নিয়ে অরুণাচল ভারতের অংশ নয় তা প্রচার করছে দেশ ও দেশের বাইরে। এদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিলে কিছু রাজনৈতিক দল দেশের মধ্যে হইচই শুরু করে দেয়। মুখোশের আড়ালে থেকে এরা সবাই মিলে দেশের সর্বনাশ চাইছে। আর দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমান তালে লড়াই করে চলেছেন।

—শ্যামল কুমার হাতি,

চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

সব কিছুর সহায়ে আছেন শক্তিরূপিণী মাতৃকা

সুতপা বসাক ভড়

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।'

—জড়, চেতন সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

সমগ্র ভারত এবং কালে কালে সমগ্র পৃথিবী তাঁর পবিত্র স্পর্শে নবরূপে পূর্ণ হয়ে একদিন কৃতার্থ হবে। কারণ ব্রহ্মসদ্ভাবে ব্রহ্মশক্তি— সর্বদা অমোঘ, অবিনাশী, সর্বান্তর্নিহিত থেকে সর্বদা সকলের নিয়মনকারী।

বেদ বলেন— প্রাচীনা হলেও শক্তি নিত্য নবীনা, গুপ্তভাব থেকে ব্যক্তা হলেই নবীনা বলে প্রতীয়মানা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছেন।' শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, লোপের তো প্রশ্নই ওঠে না! ঘন বা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়ে দেখেই আমরা শক্তির কখনও বৃদ্ধি, কখনও হ্রাস আবার কখনও একেবারে লোপ চিন্তা করি মাত্র।

এক শক্তিই বারবার গুপ্ত থেকে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত থেকে গুপ্তভাব প্রাপ্ত থেকে ব্যক্ত ও ব্যক্ত থেকে গুপ্তভাব প্রাপ্ত হন। যতবার ব্যক্ত, ততবার নতুন। যতবার গুপ্ত, ততবার লুপ্ত বলে মনে হয়। কালে কালে এই খেলা চলছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, মহাদেশ, সমগ্র জগৎ নিয়ে নিত্য এই খেলা চলছে। তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালার শিখরে সমুদ্র গর্জন এবং সমুদ্রগর্ভে দেশ-জনপদের অস্তিত্ব আমাদের সামনে বিদ্যমান। প্রসিদ্ধি আছে— শতবর্ষে জনপদ, আবার শতবর্ষে অরণ্য।

এইভাবে কত জাতি ও সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনরায় জেগে উঠেছে। আবার ব্যক্তিগত জীবনে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের শক্তির পার্থক্যও সহজেই অনুমেয়। ভারতের যোগী-ঋষিরা অনুভব করেছেন পুনর্জন্মের মাধ্যমে শক্তির সেই পুনর্বিকাশকে। সুতরাং কবিকল্পনা যখন আমাদের চোখে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখন— প্রফুল্ল কমলোপরি অধিষ্ঠিতা, লঘুকায়া অপূর্ব সুন্দরীর পুনঃ পুনঃ গজগ্রাম এবং গজ-উদ্ধার করার চিত্র আমাদের মানসপটে চিত্রিত হয়ে ওঠে। অথবা দেবর্ষি নারদ একদিন দেখেন যে ভগবতী মহামায়া সূচিছিদ্রে বার বার হাতি ঢোকাচ্ছেন আর বেরও করছেন— একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একবার জগন্মাতা মহামায়ার স্বরূপতত্ত্ব জানতে আগ্রহী হলে দেখেন— অপূর্ব সুন্দরী নারী সর্বাঙ্গসুন্দর সন্তান প্রসব করলেন, তাকে যত্ন করে লালন পালন করলেন এবং কিছুকাল পরে সহর্ষে তাকে গ্রাস করলেন! শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করলে, শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপে বিপরীত গুণধারিণী, তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানী, দার্শনিকেরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন— শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের হ্রাস হয় না। গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাব হয় মাত্র।

আবার, বহুকাল গুপ্তভাবে অবস্থিত থেকে শক্তির বিকাশ যে শরীর-মন আশ্রয়ে হয়, তাঁকে আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উচ্চাসনে বসাই। জড়রাজ্যে তাঁকে বলি আবিষ্কারক, মনোরাজ্যে তিনি দার্শনিক এবং ধর্মরাজ্যে তিনি হলেন মুক্তস্বভাব ঋষি অথবা শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহধারী অবতার।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা কিছু স্পর্শ করছি, মনের দ্বারা যা কিছু চিন্তা-ভাবনা, অনুমান-গঠন করছি— সবকিছুর সহায়ে আছেন শক্তি। সবকিছুই শক্তিরাজ্যের অধিকার ভুক্ত। দেবী বলেন—

'ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।

* * *

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ।।'

—ঋক্—দেবীসূক্ত

—আমার জন্যই সকলে জীবিত রয়েছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাদি করতে সক্ষম হচ্ছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান, সেজন্য তোমাকে এইসকল বলছি।

ব্রহ্মশক্তির হিংসক অসুরদের বধের জন্য ধনুর্ধারী রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা ছিলাম। আবার আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধে নিযুক্তা হই। আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়ে আছি।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীশ্রীচণ্ডী।

২.ঋক্—দেবীসূক্ত।

৩. ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ।

পঞ্চামৃতের মধু : রোগনাশক ও স্বাস্থ্যকর

ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে

আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে, পঞ্চামৃতের মধ্যে সবথেকে উপকারী হলো মধু। দেবতার পূজাপাঠ থেকে মৃত্যুর পরেও মধুর প্রয়োজন হয়। পঞ্চামৃতর মধ্যে আছে গোরুর দুধ, দই, ঘি, শর্করা (গুড়) ও মধু। এই পাঁচটি পেয়কে পঞ্চামৃত বলা হয়। আয়ুবর্ধন, শরীরকে সুস্থ ও স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যও এই পাঁচটা খুব উপযোগী। সেজন্যে আয়ুর্বেদিক ওষুধের সঙ্গে অনুপানে এই পাঁচটার ব্যবহার বেশি। তার মধ্যে মধু সবথেকে উল্লেখযোগ্য। মধুকে অনুপান হিসেবে নিলে ওষুধের শক্তি ও গুণ বেড়ে যায়। ওষুধ রূপেও স্বতন্ত্রভাবে মধু খাওয়া যায়।

● নবজাতককে মায়ের দুধের পরে প্রথমে মধুই দেওয়া হয়।

● বাচ্চাদের ডিহাইড্রেশন হলে জলে মিশিয়ে মধু দিতে হয়।

● মেদ কমানোর জন্য সকালে ৩০০ মিলিলিটার গরম জলে দু' চামচ ১০ মিলিলিটার মধু মিশিয়ে খেলে কুড়ি থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে ইতিবাচক পরিণাম পাওয়া যাবে।

● রোগা ব্যক্তি মধু খেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। তার জন্য ২০০ মিলিলিটার ঈষদুষ্ণ দুধের সঙ্গে দু' চামচ মধু মিশিয়ে খেতে হয়।

● ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চারা বিছানায় প্রস্রাব করে। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রাত্রিবেলা ঘুমাবার আগে একটু মধু খাওয়ালে নিদ্রাবস্থায় প্রস্রাব হবে না।

● কোষ্ঠকাঠিন্য উপশমের জন্য উপকারী মধু। রাত্রির খাওয়ার পরে, বিছানায় যাওয়ার আগে, এক গ্লাস জলের মধ্যে ২-৩ চামচ মধু মিশিয়ে খাওয়ার পরে, ৫-৭ মিনিট হাঁটার পর ঘুমোলে সকালে পেট পরিষ্কার হবে।

● চর্মরোগেও লাভকারী মধু, একটু জলে মিশিয়ে খেতে হয়।

● যে কোনো বয়সে মহিলাদের ঋতুপর্বে অতিস্রাব হলে, প্রতিদিন সকালে গরম জল মিশিয়ে মধু খেতে হয়। রজস্বলা মায়েদের অতিস্রাব হলে দু' চামচ মধু গরম জলে মিশিয়ে সকালে ও বিকালে খেতে হয়।

● রক্তচাপ রোগে প্রতিদিন সকালে এক চামচ মধু ৩০০ মিলিলিটার জলে মিশিয়ে খেলে উপকার হয়। এছাড়া আর কিছু অন্য ফলমূলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বহু উপকার পাওয়া যায়।

● হৃৎপিণ্ডের পুষ্টিবর্ধন করে মধু। এক চামচ মধু, আধ চামচ আমলকির চূর্ণ ও অর্ধেক পাতিলেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে হৃদযন্ত্রের শক্তিবর্ধন করে। হৃদরোগের ভয় থাকে না।

● সম্পূর্ণ আহার মধু। মধুর সঙ্গে কলা, দুধ মিশিয়ে খাওয়াটাকে আয়ুর্বেদ 'সম্পূর্ণ আহার' বলেছে।

● সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়াতে মধু খুবই উপকারী। এই রোগে দু' চামচ মধু ও এক চামচ আদার রসের সঙ্গে এক চামচ তুলসীপাতার রস মিশিয়ে দিনে তিন চারবার রোগীকে খাওয়ালে আর সর্দি, কাশির ভয় থাকবে না।

● সৌন্দর্য প্রসাধনের ক্ষেত্রেও মধু প্রয়োজনীয় হলুদ, গোলাপজল ও পাতিলেবুর রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে লাগালে চোখের নীচের কালো দাগ উধাও হয়। মুখমণ্ডলে কালো ছায়ার মতো যে দাগ দেখা যায় সে কিছুদিন পরে দেখা যাবে না।

শুদ্ধ মধু কী করে বোঝা যাবে—

● রুটিতে মধু লাগিয়ে কুকুরকে দিলে খাবে না।

● মাছির উপর মধু ঢেলে দিলেও মাছি উড়ে বেরিয়ে যাবে।

● শুদ্ধ মধুর এক ফোঁটা এক গ্লাস জলে ফেলে দিলে মধু নীচে গিয়ে বসে যায়। জলের মধ্যে মিলবে না।

● তুলোতে শুদ্ধমধু লাগিয়ে, আগুন ধরিয়ে দিলে মোমবাতির মতো জ্বলে উঠবে।

● শুদ্ধ মধু কোনোদিন খারাপ হয় না।

● শুদ্ধ মধুতে ফুলের গন্ধ থাকে, খেলেই বোঝা যায়।

দীপাবলি আজ এক সর্বজনীন উৎসব

ধীরেন দেবনাথ

আলোর উৎসব 'দীপাবলি' প্রতি বছরের মতো ভারত-সহ বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হয় অপরিসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে। মহালয়ার অমাবস্যা অন্তে দুর্গোৎসব যার সমাপ্তি দশমী তিথিতে এবং পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয় ধন ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর পূজা। তারপর পরবর্তী অমাবস্যা তিথিতে পালিত হয় মহাশক্তির প্রতীক শ্রীশ্রীকালী বা শ্যামাপূজা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। আলোমালায় সেজে ওঠে প্রতিটি ঘরবাড়ি-উপাসনালয়। এই যে আলোক প্রজ্বলনের উৎসব, একেই বলা হয় দীপাবলি বা দীপান্বিতা। আলো জ্বালিয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে— '...তমসো মা জ্যোতির্গময়'। অর্থাৎ আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও। সৃষ্টিকর্তার কাছে হিন্দু সমাজের এই যে অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার তীব্র আকুতি— সেটাই হচ্ছে 'দীপাবলি' উৎসব পালনের তাৎপর্য ও সার্থকতা।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মত ও পথ ভেদে এই যে দীপাবলি উৎসব তা আজ আর হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কারণ উল্লিখিত মন্ত্রে কোথাও হিন্দুর কথা উল্লেখ নেই। সেই সুবাদে ওই মন্ত্র সর্বজনীন বিধায় সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য। আর তাইতো সনাতন হিন্দু ধর্ম বিশ্বকে শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, সমানতার কথা জানতে পেরেছে। জানাতে পেরেছে হিন্দু ধর্মের সর্বজনীনতার কথা। ভারতবর্ষকে চিনেছে তারা নতুনভাবে। হিন্দু ধর্মের নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা দ্বারা তারা হচ্ছে প্রভাবিত, আকৃষ্ট ও প্রাণিত। তাই দীর্ঘদিন ধরে দেশে দেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সেইসব দেশের ভিন্নধর্মীদের অনেকেই উদ্‌যাপন করছে ভারতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব, বিশেষত আলোর উৎসব 'দীপাবলি'।

সত্যি বলতে কী, বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে সেমিটিক বা আরবের মাটিতে উদ্ভূত মতবাদ যখন তাদের নিজ নিজ মতাবলম্বীদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, ইহলোক-পরলোক, লোভ-লালসা ইত্যাদির কথা বলে, তখন হিন্দুধর্ম বেদ, পুরাণ, দর্শন, গীতা ইত্যাদি-সহ বিশ্বমানবতার কথা বলে। স্বামীজী তাঁর চিকাগো ভাষণে বিশ্ববাসীকে সে কথাই শুনিয়েছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছেন আত্মীয়তার সেতু। তাই আজ যখন দীপাবলির পুণ্যক্ষণে ভারতের ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে দীপালোক তখন বিশ্বের বহু দেশের ঘরে ঘরেও জ্বলে ওঠে মঙ্গলালোক। এই আলোক শুধু অন্ধকারকেই বিদূরিত করে না, দূর করে মনেরও কালো। অর্থাৎ হিংসা,বিদ্বেষ, কাম, ক্রোধ, অহংকার, ঘৃণা, আবিলতা ইত্যাদি। মনকে করে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, অহিংসা, পবিত্রতা, সাম্য ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, মানবতা তথা চিরন্তন পুণ্যালোকে আলোকিত। আর এই সত্যটাই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা, যা অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে অনুপস্থিত। হিন্দু ধর্মই বলে, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'।

কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে মহা ধুমধামে উদ্‌যাপিত হয়েছিল শুভ 'দীপাবলি' উৎসব। তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং প্রদীপ প্রজ্বলন করেছিলেন। হোয়াইট হাউসের বাসিন্দাদের নিয়ে সপরিবারে তিনি পালন করেছিলেন এই আলোর উৎসব। আগের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা হোয়াইট হাউসে প্রথম এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন। ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন— 'শুভ দীপাবলি'। ট্রাম্পের মতো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে 'দীপাবলি'র শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেছিলেন, 'ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কাছে 'দীপাবলি' উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের জন্য আপনারা যা করেছেন, তার জন্য আপনাদের জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা। আপনাদের অবদান ছাড়া ব্রিটেন এত উন্নতি করতে পারত না। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পুলিশ, সেনা, স্বাস্থ্য— প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয়রা এদেশকে সমৃদ্ধ করেছে।'

তাঁর বার্তায় উঠে এসেছিল লেস্টারের 'গোল্ডেন মাইল'-এর আলোকসজ্জা, মিষ্টি-সিঙাড়া বিতরণের কথা। এছাড়াও ছিল যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করে অযোধ্যায় ফিরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর প্রদীপ প্রজ্বলনের বার্তাও। ব্রিটেনের বিরোধী দলনেতা জেরেমি করবিনও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জানিয়েছিলেন শুভেচ্ছা। 'দীপাবলি'র শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশ্বের বহু দেশের প্রধানরা।

তাই 'দীপাবলি' আজ বিশ্বজনীন এক মহোৎসব। আর এখানেই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব। ঋগ্বেদের ভাষায় 'দীপাবলি' হচ্ছে— 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'। ■

সকলের জন্য দীপাবলীর শুভেচ্ছা রইল—

—: সৌজন্যে :—

সৌরভ ঘোষ

গোপাল চক্রবর্তী

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।।
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তীমহাসুরান।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্।।
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি যোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।।
তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ন্ত্যতিভৈরবম্।।
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ।।

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের সপ্তশতিতম অধ্যায়ে দেবী কালিকার আবির্ভাব সম্পর্কিত এই কাহিনি বিবৃত আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের প্রাক্কালে দেবী অম্বিকার ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট ফলক থেকে শীঘ্র আশ্চর্য খট্বাঙ্গ ধারিণী নরমালা বিভূষণা অসিপাশায়ুধা করাল-বদনা, কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী নিষ্ক্রান্তা হলেন। সেই দেবীর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, মাংস সকল শুষ্ক, ভয়ংকরী। তাঁর বদন অতি বিস্তৃত, জিহ্বা লক্ লক্ করছে, নয়ন গাঢ় নিমগ্ন ও রক্তবর্ণ। তাঁর ভয়ংকর নাদে দিক্ সকল

বঙ্গ ও বাঙ্গালিকে করুণাধারায় সিক্ত করেছে মা কালী

আপূরিত। অনন্তর সেই দেবী দৈত্যসৈন্য সমূহের উপর বেগে পতিত হয়ে অসুরদের বিনাশ করতে করতে অসুর সৈন্যদের ভক্ষণ করতে লাগলেন। ঘোর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের জন্য ইনি কালিকা নামে আখ্যায়িতা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রে, গ্রন্থে কালীর সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে।

দেবী কালিকার আবির্ভাব সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণে আরও একটি কাহিনি আছে। অসুরদের সেই মহতী সেনা ক্ষণকালমধ্যে বিনাশিত হলো দেখে চণ্ডাসুর, অতি ভীষণা সেই কালীদেবীর প্রতি বেগে ধাবমান হলো এবং মুণ্ডাসুর সেই ভীমাক্ষী দেবীকে অতি ভয়ংকর শরবৃষ্টি ও সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই চক্রসমূহও দেবীর মুখে প্রবেশ করছে। অতঃপর সেই দেবী চণ্ডাসুরের প্রতি ধাবমানা হয়ে কেশাকর্ষণ করে অসিদ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন। চণ্ডকে নিপাতিত দেখে মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হলো। তখন দেবী ক্রোধে তাকেও খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী করলেন। চণ্ডমুণ্ডকে নিহত হতে দেখে

With Best Compliments from -

V2R SOLUTION

KOLKATA

অসুরসৈন্যরা ভয়াতুর হয়ে পলায়ন করল। তখন দেবী কালী চণ্ড-মুণ্ডের মস্তক কর্তন করে সেই কর্তিত মুণ্ড হস্তে কৌশিকী দেবীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রচণ্ড অট্টহাসের সঙ্গে বললেন—

—আমি মহাপাষণ্ড চণ্ড-মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে হনন করে তোমার নিকট উপহার প্রদান করলাম, এবার যুদ্ধযজ্ঞে তুমি নিজেই শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করবে।

সেই চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করে তাদের কর্তিত মস্তক স্বীয় হস্তে ধারণ করতে দেখে দেবী চণ্ডিকা কালী দেবীকে অতি মধুর বাক্যে বললেন— —হে দেবী, চণ্ড ও মুণ্ডকে নিধন করে, তাদের ছিন্ন মস্তক হস্তে তুমি উপস্থিত হয়েছ, এই জন্য লোকমধ্যে তুমি চামুণ্ডা নামে কীর্তিতা হবে।

এছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে আলাদা আলাদা ভাবে দেবী কালীর সৃষ্টিকথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন অদ্ভুত রামায়ণে বলা হয়েছে, রাবণ বধের পর শতানন-রাবণ বধের সময় সীতামাতা কালীরূপ ধারণ করে তাকে নিধন করেছিলেন। আবার কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বামন পুরাণ অনুসারে মেনকার গর্ভজাত হিমালয়কন্যা উমা,পার্বতী, কালী অভিন্না। নিরুত্তরতন্ত্র, চামুণ্ডাতন্ত্রাদি, শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, মালিনীবিজয় প্রভৃতি শাস্ত্রে কালী নামটি বার বার উল্লিখিত হয়েছে। বৌদ্ধ দেবী মা তারার সঙ্গে দেবী কালী অভিন্ন।

বঙ্গদেশে প্রচলিত কালীমূর্তির উদ্ভাবক নবদ্বীপের বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে যে কালীমূর্তির পূজার প্রচলন করেছিলেন তা আমাদের অতি পরিচিত আধুনিক কালের কালীমূর্তি।

কালীমূর্তি নিয়ে রহস্য ও বিতর্কের শেষ নেই। কালীতত্ত্বের ব্যাখ্যারও অন্ত নেই।

দক্ষিণাকালী : মহাকালসংহিতা অনুসারে আদ্যাকালীই দক্ষিণাকালী। দক্ষিণদিকে যমের অবস্থান, কালী নামে ভীত হয়ে যম ছুটে পালায়, তাই জগতে কালিকাদেবী 'দক্ষিণা' নামে পরিচিতা। দক্ষিণামূর্তি নামক ভৈরবের আরাধিতা বলেও দেবী দক্ষিণাকালী নামে খ্যাতা। সাধনার প্রভাবে বামশক্তি জাগরিতা হয়ে দক্ষিণশক্তিপুরুষকে জয় করে দক্ষিণানন্দে নিমগ্না হয়, তাই দেবী দক্ষিণাকালী। শবরূপী শিবের ওপরে দণ্ডায়মান দেবীর দক্ষিণ পদ অগ্রভাগে থাকলে, দেবী সেই ক্ষেত্রে দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা।

কালী কৃষ্ণবর্ণা : মহানির্বাণতন্ত্রে কালীর কৃষ্ণবর্ণের একটি ব্যাখ্যা আছে। শ্বেত পীতাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণ বর্ণে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সর্বভূত কালীর মধ্যেও প্রবেশ করে অর্থাৎ বিলীন হয়। এই জন্য যারা মোক্ষের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁরা নির্গুণা, নিরাকারা, কল্যাণময়ী কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ নিরুপণ করেছেন। পরাশক্তি অরূপা, সুতরাং বর্ণহীন। সেখানে বর্ণের অভাব তাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। কর্পুরাদিস্তোত্রের প্রথম শ্লোকে কালিকাদেবীকে বলা হয়েছে ধান্তধারাধররুচিরুচিরা অর্থাৎ নীল বর্ণ মেঘের মতো মনোজ্ঞা।

দিগম্বরী : মা জগদকারণ, তিনি আদ্যা, নিত্যা, অব্যক্ত, তাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তিনি বিমূর্ত। কালী দিগম্বরী বা দিগ্‌বস্ত্রা। বস্ত্র আবরণ। সবচেয়ে সূক্ষ্ম আবরণ মায়া। কালী পূর্ণবম্ভময়ী বলে মায়াতীতা। অসীম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তিনি বিস্তৃতা, অবস্থিতা। এমন কোনও বসন/বস্ত্রখণ্ড নেই যা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী সত্ত্বাকে আবৃত করতে পারে। তাই তিনি আবরণশূন্যা, দিগম্বরী, দিগ্‌বসনা।

মুক্তকেশী : কালী মায়াতীতা, কিন্তু অনন্ত জীবকোটিকে মায়াপাশে বদ্ধ করেন। তাঁর মুক্তকেশ জালমায়া পাশের প্রতীক। আবার কালী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও মুক্তি বিধান করেন বলে তিনি মুক্তকেশী।

কালী ত্রিনয়না : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই সেই ত্রিগুণাময়ী ত্রিকালদর্শিনী মায়ের নয়ন পথে সর্বক্ষণ প্রতিভাত রয়েছে। ধ্যানান্তরে দেখতে পাওয়া যায় 'বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্ত বিস্ফুরিতাননাং'। মায়ের নয়নত্রয়ে বিশ্বের বহ্নি। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপী তিনটি নয়ন সর্বক্ষণ উদ্ভাসিত রয়েছে। তা যথাক্রমে বিশ্বের তেজঃ বা দীপ্তিতে প্রথম, জ্যোতি বা প্রকাশে দ্বিতীয় এবং শান্তি বা রূপে তৃতীয় ভাব বিকাশ করছে।

কালী করালবদনা : মহাকাল সৃষ্টি থেকে চিরকাল ধরে সমস্তই কলন অর্থাৎ গ্রাস বা কালগ্রস্ত করছেন, সেই কারণে তিনি জগৎ সংহারক মহাকাল নামে কীর্তিত। মহাপ্রলয় কালে সেই মহাকালকেও যিনি গ্রাস করেন বা নিজ অঙ্গে লয় করে নেন, তিনি করালবদনা কালী। করাল বদন আবার তাঁর কঠোরতারও নিদর্শন। অসুরনাশিনী মায়ের মুখমণ্ডলে সেই আদি দেবাসুর যুদ্ধের স্বরূপ ঘোর সমরনিষ্ঠুরতাও প্রতিভাত হয়েছে। আবার করাল নামক অসুরকে নিধন করে দেবী করালবদনা হয়েছিলেন।

কালীর লোল জিহ্বা : দেবীর করালবদনের ঘোর দন্তশ্রেণী তাঁর অবিশ্রান্ত লয় ক্রিয়ারই নিদর্শন। ধ্যানান্তরে দেখতে পাওয়া যায়, 'দেবীং লোলজিহ্বাং দিগম্বরীং।' দন্তসমূহের দ্বারা আবার তাঁর লোল-জিহ্বা সদা নিপীড়িত হচ্ছে। জিহ্বার অন্যনাম রসনা। রসনাই সকল রস গ্রহণের মুখ্য যন্ত্র। জীবের রসনাই যেন রসের জ্ঞানরূপ বিন্দুটি চ্যুত হয়ে বাসনা বা কামনাস্বরূপে কার্য করে। মা সেই লোলজিহ্বা নিপীড়ন দ্বারাই সাধককে তাঁর সর্ববিধ লালসা-সংযমেরই ইঙ্গিত করছেন। রসনা সততই রক্তাভ বা লালবর্ণ বিশিষ্ট। ঘোর রক্তবর্ণই যথার্থ রজোবর্ণ, কিন্তু রসনার বর্ণ ঘোর লাল নয়, ঈষৎ গোলাপি অর্থাৎ লাল বর্ণের সঙ্গে সামান্য শ্বেতাভাযুক্তা। এই লালবর্ণই পূর্বকথিত রজোগুণের রজোপ্রধান ঈষৎ সত্ত্বনিঃসৃত ভাবই রসনা।

পীনোন্নতপয়োধরা : জগজ্জননী কালী পীনোন্নতপয়োধরা। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো পালনকর্ত্রী দেবী স্তন্যরূপ অন্নাদি দিয়ে ত্রিজগৎ পরিপালন করছেন।

চতুর্ভুজা : দেবী কালী চতুর্ভুজা।

ফঃ ৪

With Best Compliments from -

Ganapati Tradelink

Kolkata

দেবীর চতুর্ভুজের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যেতে পারে। মহাকালী পূর্ণরূপা। তিনি মহাকাশরূপিণী। কেননা আকাশ ব্রহ্ম, আবার কালীও ব্রহ্ম। মায়ের চার হাত চতুর্বর্গ প্রদায়িণী।

দেবীর বাম দিকের উপরের হাতে খড়্গ আর নীচের হাতে ছিন্নমুণ্ড। দেবী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা নিষ্কাম সাধকদের মোহপাশ ছিন্ন করেন— দেবীর হাতের খড়্গের এই তত্ত্বার্থ। তত্ত্বজ্ঞানের আধার মস্তক। তাই দেবীর হাতে ছিন্ন মস্তক। দেবীর ডান দিকের উপরের হাতে অভয় মুদ্রা এবং নীচের হাতে বরমুদ্রা। এর অর্থ দেবী সকাম সাধককে অভয় ও অভীষ্ট বর প্রদান করেন। মা দ্বেষকদের ভয় এবং সন্তানদের অভয় প্রদান করেন।

শবহস্তকৃত কাঞ্চী : কালীর কটিদেশে শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী। হাত মানুষের প্রধান কর্ম সাধন অর্থাৎ কাজ করার যন্ত্র। তাই হাতকে কর্মের প্রতীক বলা যায়। এই জন্যই মৃত মানুষের প্রধান কর্মসাধনাভূত হস্তসমূহের দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী বিরাট্‌রূপিণী মহাদেবীর গর্ভধারণ যোগ্য নিম্নোদর তথা মাতৃঅঙ্গের ঊর্ধ্বস্থিত কটিদেশে কল্পিত হয়েছে।

শববক্ষাস্থিতা : কালী শবরূপী শিবের বক্ষোপরি অবস্থিতা। শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে— শব শব্দের দ্বারা প্রেতরূপ ব্রহ্ম বুঝতে হবে—

শব ইত্যক্ষরে ব্রহ্মাবাচকঃ প্রেতনির্ণয়ং।

—গায়ত্রী তন্ত্র, ১, ব্রাহ্মণ পটল

দেবীর পদতলে শিব, এই ব্যাপারটির অন্য ব্যাখ্যাও আছে। আদ্যাশক্তি ভগবতী কালী আপন ভাবে বিভোর হয়ে ক্রীড়াসক্ত বালিকার মতো জগতের সৃষ্টি করছেন, আবার বিনাশ করছেন। আনন্দময়ীর এই লীলা অবিরাম চলছে। পুরুষরূপ সদাশিব দেবীর চরণতল থেকে দেবীর এই অপূর্ব লীলা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আছেন। আবার বলা হয় মহাশক্তিরূপিণী কালীর সামনে কাল অতি তুচ্ছ ও নিষ্ক্রিয়। দেবীর পদতলে শবরূপী মহাকালের কল্পনায় এই তত্ত্বটিই ব্যক্ত হয়েছে।

কালী শ্মশানবাসিনী : কালরূপে কালী জীবকে সংহার করেন। জীবের স্থূল দেহ শ্মশানেই বিলুপ্ত হয়। কাজেই শ্মশান সংহার সূচক। এই জন্য সংহারকারিণী কালীকে শ্মশানবাসিনী বলা হয়েছে। শ্মশানে চিতাগ্নিই শবকে আত্মসাৎ করে। এই চিতাগ্নি কালী স্বয়ং। গুপ্ত সাধনতন্ত্রে বলা হয়েছে দক্ষিণাকালী বহ্নিরূপা। এই জন্যই তিনি শ্মশানবাসিনী—

বহ্নিরূপা মহামায়া সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

অতএব মহেশানি শ্মশানালয়বাসিনী।।

—গুপ্তসাধনতন্ত্র, পৃ. ৬

অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষে দেবী কালীর পূজা প্রচলিত। রামায়ণ মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে দেবী কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কালী মাহাত্ম্য এবং কালী তত্ত্ব নিয়ে পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে কালিকাপুরাণ অন্যতম। তবে বঙ্গদেশে কালীপূজার প্রচলন সম্ভবত নবদ্বীপের তান্ত্রিকাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাত ধরে। সাধক আগমবাগীশ দেবী কালীর মূর্তি নিয়ে চিন্তিত। একরাতে স্বপ্নে দেখেন, মা বলছেন— কাল প্রাতে সর্বপ্রথম যে মূর্তি দেখবি সেই আমার মূর্তি, সেই মূর্তি তুই পূজা করবি।

পরদিন প্রাতে আগমবাগীশ সর্বপ্রথম দেখেন এক কৃষ্ণবর্ণা রমণী ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। হঠাৎ আগমবাগীশকে দেখে সে লজ্জায় জিভ কাটে। মায়ের আদেশ অনুসারে এই রমণীর মূর্তিকে শাস্ত্রসম্মত করে তৈরি হয় কালীমূর্তি। কালী বঙ্গদেশের নিজস্ব দেবী, বাঙ্গালি কালী মাকে একান্ত আপন করে নিয়েছে। কখনও মাতারূপে, কখনও কন্যা রূপে মা কালী সাধক ভক্তদের সঙ্গে নিত্য লীলা করেছেন। কৃষ্ণানন্দ, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, সর্বানন্দ, রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, তারাচরণ প্রমুখ কালী সাধক মায়ের করুণাধারায় বঙ্গ ও বাঙ্গালিকে সিক্ত করেছে। বঙ্গদেশের সর্বত্র এবং বঙ্গের অঞ্চল বিশেষে দেবী কালী নানা রূপে এবং নানা নামে পরিচিতা। যেমন, দক্ষিণাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ফলহারিণীকালী প্রভৃতি। ■

> “কালী বঙ্গদেশের নিজস্ব দেবী, বাঙ্গালি কালী মাকে একান্ত আপন করে নিয়েছে। কখনও মাতারূপে, কখনও কন্যা রূপে মা কালী সাধক ভক্তদের সঙ্গে নিত্য লীলা করেছেন।”

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE
8/1/B, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 027, India
www.paharpur.com
CIN : U02005WB1949PLC018363
Ph. +91-33-4013 3000
Dir. +91-33-4013 3403
Fax : +91-33-4013 3499
vswarup@paharpur.com

রোগ প্রতিরোধের জন্যই ভূতচতুর্দশীতে চোদ্দোশাক খাওয়ার বিধান

অচিন্ত্যরতন দেব

পণ্ডিত রঘুনন্দনের মতে চোদ্দো শাকে যা উল্লিখিত আছে তার বাস্তব বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। কারণ সব প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা ব্যধি আসে ও হয়। কিন্তু বঙ্গপ্রদেশে ঋতুগুলির প্রকট খুব বেশি। প্রতি ঋতুতে নানান রোগ হয়। বিশেষ করে সর্দি কাশি। সেই জন্য আশ্বিন ও কার্তিক মাস যমদংষ্ট্রা মাস বলা হয়।

চোদ্দো শাক কোনোটার সবটাই, কোনোটা পাতাশাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি শাক গুণসম্পন্ন ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(১) **ওল :** কিছু বন্য ওল আছে যাদের কোষে ক্যালসিয়াম অক্সালেট-এর কেলাসের সূচগুচ্ছ থাকায় ওটা খেলে গলায় ওগুলো বিঁধে যায়। তার জন্যই গলা চুলকোতে থাকে ও ফুলে যায়। তখন তেঁতুল বা লেবু খেলে ওই সূচগুলো গলে যায়। ওলের প্রচুর শক্তি। অর্শ রোগের মহান ওষুধ। ওলের টুকরোর খোসা ও মুখী বাদ দিয়ে মাটি লেপে রোদে অল্প শুকিয়ে নিয়ে উনুনে ফেলে পোড়াতে হবে, যেমন কাঁচা বেল পোড়ানো হয়। তারপর উপরের মাটি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হয়। একেই ওল পোড়া বলে। অর্শে, কোষ্ঠবদ্ধতায়, রক্তস্রাবে, গাঁটে বাতে এই পোড়া ওল ঘি দিয়ে মেখে খেতে হয়। সামান্য নুনও দিতে হবে। ছুলি ও দাদের উপর ঘি মাখিয়ে পোড়া ওল ঘষলে তিন দিনেই সেরে যায়। হাজাতে ওলের ডাঁটার রস লাগালে অনেক আরাম পাওয়া যায়। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ও বিছা হুল ফোটালে ওলের ডাঁটার রস ঘষলে পাঁচ মিনিটে কমে যায়। ওলে ভিটামিন-এ-বি, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম অক্সালেট ও এনজাইম আছে।

ওল কন্দ গুল্ম বর্ষজীবী। এর সংস্কৃত নাম শূরণ। বন্য ওলের নামই শূরণ আর যেটা চাষে জন্মে তার নাম ভূকন্দ। এই কন্দ থেকে বহু সাদা শিকড় বের হয়।

(২) **কেঁউ শাক (পাতা)** : কৃমি নাশ করে। যে কোনো জাতের কৃমি হোক না কেন।

কেঁউ কন্দমূলোদ্ভব উদ্ভিদ। ফুল সাদা রঙের। সাধারণত বর্ষার শেষে ফুল ও তারপরে ফল হয়। স্যাঁতসেঁতে পতিত

জমিতে এটি জন্মে থাকে। এর সংস্কৃত নাম কেঁমুক। বাংলা ও হিন্দিতে প্রচলিত নাম কেঁউ বা কেমক। মালাবারে পেংবা নামে পরিচিত।

(৩) **বেতো শাক :** লিভার ভালো রাখে। এই শাক দেহ ও মনকে শোধন করে। এর অপর নাম যব শাক। যেখানে সেখানে জন্মে বলে এর নাম বাস্তুক। বেতোশাক খুব উপকারী। শীতকালে বেশি পাওয়া যায়। লিভার, বাতের ব্যথা উপশম করে ও যকৃৎ ভালো রাখে। বেতোশাকের রস অল্প নুন মিশিয়ে খেলে ও পরে একটু হরিতকী খেলে হিক্কা বন্ধ হয় এবং যে কোনো রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যাদের ঘুসঘুসে কাশি, আর ছোটো কৃমির উপদ্রব আছে তারা এই শাক কিছু দিন খেলে উপকার পাবেন। হাত-পা ফোলা হলে বেতো শাক সিদ্ধ জল খেতে হবে এবং তার সঙ্গে এই শাক বেটে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বেতো শাকের রস মাথায় মাখলে খুসকি উকুন সেরে যায়। বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ বেতোশাক নাশ করে। শিবচর্তুদশীর পরের দিন এই শাক ও কুল দিয়ে একটি আহার্য তৈরি হয়। তাকে কুল বেতো বলে।

শাক জগতে বেতোকে বলা হয় শাকরাজ। গম, আলু বা সর্ষের খেতে আর বাস্তুভূমিতে জন্মায় বাস্তুক। গুল্ম জাতীয় ছোটো ছোটো গাছ, পাতা তুলসীর পাতার মতো কিন্তু ধারগুলি ঢেউ খেলানো। আর একটি নাম জ্বরনাশকারী। সম্ভবত অগ্নিবল বৃদ্ধি করে বলেই তার এই জ্বরনাশিত্ব শক্তি আছে। বেতোশাক ঘোল এবং অল্প লবণের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে খেয়ে একটু পরে হরিতকি সেবন করলে, সহজে কোনও ব্যধি হবে না।

(৪) **কালকাসুন্দে :** কাশকে খর্দিত করে তাই এর নাম কাসখর্দ। পিত্ত দোষ, কোষ্ঠবদ্ধতায় এর উপকার অসীম। গলাভাঙা, গলাবুক জ্বালায় পাতা ও ফুল চার কাপ জলে ফুটিয়ে এক কাপ থাকতে নামিয়ে সকালে ও বিকালে অর্ধেকটা করে এক চামচ মধুর সঙ্গে খেতে হবে। হুপিং কাশিতে কালকাসুন্দের পাতার গুঁড়ো পাউডার চিনির রসে পাক করে লজেন্সের মতো পাকিয়ে রাখুন। সকাল-সন্ধ্যে একটা করে চুষে খান, মূর্ছায়, ঘুসঘুসে জ্বরে, হাঁপানি, নালী ঘায়ে অনেক উপকার দেয়।

কালকাসুন্দে বর্ষার শুরুতে বীজ থেকে গাছ বের হয়। বর্ষজীবী গাছ। পাতা চটকালে তীব্র কটুগন্ধ বের হয়। একটা লম্বা বোঁটায় ২ থেকে ৬ জোড়া পাতা থাকে। ফুল হয় ভাদ্র-আশ্বিনে। রং লালি হলদে, তারপরে হয় চাপ্টা শুঁটি বীজ একসঙ্গে ৪/৫টি, প্রতি শুঁটিতে ২০/২৫টি বীজ থাকে, ফাল্গুন-চৈত্রে বীজ পেকে আবার মাটিতে পড়ে। ভারতের সব প্রদেশেই পাওয়া যায়। এই গাছের পাতার শির, গাছের উপরের অংশটা একটু বেগুনে রঙের হয় বলেই একে বলে কালকাসুন্দে।

(৫) **সরিষা :** সরষে শাক খুবই উপকারী। এতে প্রচুর লোহা থাকে, সেজন্য রক্ত তৈরি হয়। অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন বাড়ে। তাইতো গর্ভবতী মায়েদের সরষে শাক খেতে বলা হয়। এছাড়া মলমূত্রে সারল্য আনে, কপালে সর্দি বসলে, দাঁতের মাড়ির ক্ষত ও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এর প্রয়োজন খুব বেশি। এতে ভিটামিন-এ থাকে।

সর্ষে প্রাচীন নির্ঘণ্টকারদের মতে বহুপ্রকার সর্ষের প্রকারভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে মৌল উপাদানের বিশেষ পার্থক্য হয়নি। গাছের গোড়ার পাতাগুলি বড়ো হয়। আকারে প্রায় ডিম্বাকৃতি ও ঈষৎ ঢেউ খেলানো। ফুল হলদে রঙের।

(৬) **নিম :** ব্লাড সুগারে রোজ সকালে খালি পেটে দশটি নিমপাতা চিবিয়ে খেতে হবে বা চার চামচ নিমপাতার রস খেতে পারেন। বেশি প্রস্রাব হয় তার সঙ্গে চুলকানি থাকলে ছয়টি নিম পাতা ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে খালি পেটে খেতে হবে। ছোটো ক্রিমি বেশি হলে নিমপাতার গুঁড়ো বা দশটি নিমপাতা খালিপেটে খেলে ক্রিমি কমে যায়। দাঁতের ব্যথা, মাড়ি ফোলা, পুঁজরক্ত পড়া, ঠাণ্ডা জল লাগলে দাঁত শিরশির করা ইত্যাদি রোগে নিম ফুল জলে সিদ্ধ করে সামান্য গরম অবস্থায় কুলি করলে সব রোগ সেরে যায়। নিমফুল ভাজা খেলে রাতকানা রোগ কিছুটা কমে, তাই নিমফুল শুকিয়ে রেখে দিতে হয়। এতে ভিটামিন-এ থাকে। কমলা রোগে নিমপাতার রস এক চা চামচ একটু মধু মিশিয়ে খালিপেটে খেতে হয়। স্বপ্নদোষ যে কোনো বয়সে হোক না কেন নিমের ছালের রস পঁচিশ ফোঁটা কাঁচা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে কয়েক দিনের মধ্যে এটা কমে যায়। আমাদের দেশে হিন্দুদের নিয়ম আছে যে শ্মশান যাত্রীকে বাড়িতে ফিরে এলে নিমপাতা দাঁতে কাটতে হয়। এটি অশুভ দূর করে। এর কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। সেজন্য বলা যেতে পারে নিমগাছ সে যুগের বৃক্ষ পুরোহিত।

নিম গাছ অনেকেই চেনেন। সেই হেতু বিশেষ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। চরক সংহিতার একটি উপদেশ, নিম অশুভ দূর করে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কথিত আছে, নিম এক প্রধান ভেষজ এবং সর্বরোগহর।

(৭) **জয়ন্তী :** ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে নানা রোগ দেখা যায়। সর্দি, কাশি, জ্বর হয়। এর হাত থেকে বাঁচতে জয়ন্তী গাছের পাতা বিশেষ উপকারী। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকাতে এই জয়ন্তীর শাখা লাগে।

জয়ন্তী বৃক্ষ বেশি উঁচু হয় না। পাতাগুলি দেখতে অনেকটা তেঁতুল পাতার মতো। সাধারণ বৃন্তে ১৪/১৫ জোড়া পাতা থাকে, সেগুলি মসৃণ লোমযুক্ত। বৃন্তাগ্রে বিজোড় পাতা থাকে না। ফুলের রং ফিকে হলদে, আর এক রকম ফুল হয় তার পিঠের দিকের রং গাঢ় বেগুনি। এই ফুলের গঠন বকফুলের (যাকে সংস্কৃতে বলা হয় অগস্ত্য পুষ্প) মতো, তবে আকারে খুবই ছোটো। পুষ্পদণ্ডে বর্ষাকালে অনেকগুলি ফুল হয়, তারপর সরু শুঁটি বের হয়। অনেকগুলি বীজ থাকে। বীজগুলির প্রকোষ্ঠ পৃথক যেমন বরবটির হয়। ফাল্গুন-চৈত্রে পাকে

এবং আপনা থেকে বীজ পড়ে যায়।

(৮) **শালিঞ্চা :** কফ, বাত নাশক, তিক্ত রস প্লীহা ও অর্শরোগের উপকারী। এই শাক খেলে ক্ষুধা বাড়ে।

সাধারণত জলা জায়গায় এই শাকটিকে বেশি দেখা যায়। জলা জমিতে যেসব গাছ হয় সেগুলির পাতা বড়ো হলেও ৩ ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। সরু সরু শাখা-প্রশাখা হয়ে প্রসারিত হয়। ফুল চ্যাপ্টা, গোলাকার ও মেয়েদের কানের ফুলের মতো কিন্তু রং সাদা। ফলও চ্যাপ্টা ধরনের। এই ফলের বাইরের দিকটায় একটা আবরণ এবং ভিতরে ছোটো ছোটো বীজ থাকে। শালিঞ্চা শাকের অপর নাম বার্মাশাক।

(৯) **গুলঞ্চ :** লতানে গাছ। জ্বরে, অরুচিতে, পচা ঘায়ে, ঘুসঘুসে কাশিতে, ক্রিমি, প্লীহা, আমাশায়, কমলা, বুক ধড়পড় করা, গনোরিয়া ও মায়ের বুকের দুধ বাড়াতে সাহায্য করে। গুলঞ্চ চিনি দুর্বলতা কমায়। অর্শ, হাম, বাত, শ্বাসকষ্টে, কুষ্ঠরোগ, বিছানায় প্রস্রাব, বায়ু বা হাইপোগ্লাইমিয়া বিনাশক।

গুলঞ্চ বৃক্ষারোহী লতা কখনও কখনও বেড়ার গায়েও দেখা যায়। দীর্ঘদিনের হলে খুবই মোটা হয় এই লতাগুলি আঙুলের মতো মোটা হলে, সরু সুতোর মতো শিকড় বেরিয়ে ঝুলতে থাকে। লতার গায়ের ছালগুলি কাগজের মতো পাতলা, ভিতরটা যেন একগোছা সুতো দিয়ে পাকানো দড়ি। স্বাদে তিক্ত ও পিচ্ছিল। ছোটো ছোটো হরিদ্রাভ সাদা ফুল ও ফল হয় মটরের মতো। নিমগাছে আশ্রয় করা গুলঞ্চ থেকে অল্প দিনেই ফল পাওয়া যায়। অম্লরসের গাছে আশ্রয় করা গুলঞ্চে ফল আসতে দেরি হয়। অর্থাৎ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হয় নিম গুলঞ্চের পাতা ও সমগ্র লতা। গুলঞ্চের আর এক নাম গুড়ুচীর।

(১০) **পলতা :** গাছটি লতানে। পাতা পিত্তনাশক, ডাঁটা কফ নাশক এবং তার ফল অর্থাৎ পটল ত্রিদোষ নাশক, আর মূল তীব্র জোলাপ যা খেলে দাস্ত হয়।

পলতা সর্বজনবিদিত এই লতা গাছটি। আমরা চলতি কথায় পলতা অর্থাৎ পটোল লতা বলে থাকি। যে কোনও পিত্তদোষকে বিনাশ করে।

(১১) **শেলুকা :** ক্ষুধা বাড়ায় ও মুখের রুচি ফেরায়।

শালুকের বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ বাংলাদেশ তথা ভারতের লোকের কাছে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয় না। শালুকের শিকড় ও কন্দ বা গেঁড়ো জলের নীচে পাঁকের মধ্যে থাকে। পাতাগুলো জলের উপর ভাসতে থাকে। ফুল ৩/৪ রকমের হয়ে থাকে। সাদা, লাল, নীল ও ঈষৎ পীতবর্ণের। ফুলগুলো অনেকটা পদ্মফুলের মতো দেখতে। সাদা শালুকের পুষ্পনাল তরকারি হিসেবে ভারতে ব্যবহৃত হয়। রাত্রের স্নিগ্ধতায় সাদা শালুকের ফুলগুলি ফোটে এবং দিনের আলোয় সেগুলি বুজে যায়। এই জন্য এর এক নাম 'কুমুদ'। ফলগুলি স্পঞ্জের মতো, সবুজ ও গোলাকার, অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ভেসে যায়।

(১২) **হিঞ্চে :** জলে হয়। এই শাক খেলে শোথ, কোষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশ করে। লিভারকে সবল করে। বাত, খোস, চুলকানি, ঘামাচি ভালো হয়। হিঞ্চে সর্বজনবিদিত শাক। এই নামকরণ এবং তার তাৎপর্য বিচার করেই। হিলমোচিকা নামটি গুণবাচী অর্থাৎ সে জীবশোণিতের ঔজ্জ্বল্যনাশক দোষকে নষ্ট করে, তাই সে হিলমোচিকা— এই শব্দটি সর্বজনীন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও তার বিশেষ শক্তি এইটাই বলে এই নামে তার প্রসিদ্ধি।

(১৩) **ঘেঁটু বা ভাঁট :** গুল্ম (ঝাড় যুক্ত ছোটো গাছ)। কাঁকড়া বিছা কামড়ালে এর পাতা ও ফুল বেটে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়। ম্যালেরিয়াতে খুব ভালো কাজ দেয়। চর্মরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতায়, পেটের ব্যথা, মাথায় উকুন হলে, শরীরের বল বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয়।

ঘেঁটু গুল্মবৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। কচি কাণ্ডের গায়ে শ্বেতবর্ণের রোম আছে। শাখা ও প্রশাখা খুব কম। পাতা লম্বায় ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে, দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি তবে অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, খসখসে ও বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। মূলকাণ্ড ও শাখার অগ্রভাগে ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা পুষ্পদণ্ড বের হয়, তাতে গুচ্ছাকারে বহু শ্বেতবর্ণ ও লাল আভাযুক্ত ফুল হয়। এর বহিরাবরণ রোমযুক্ত, চ্যাপ্টা ও কালো রঙের। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়। এর সংস্কৃত নাম 'ঘণ্টাকর্ণ'। বঙ্গে প্রচলিত নাম ঘেঁটু ও হিন্দিতে ভাট নামে পরিচিত।

(১৪) **সুষনি শাক :** এই শাকটি আমাদের শরীরে স্নায়ুতন্ত্রকে স্নিগ্ধ করে ও ঘুম পাড়ায়। শ্বাসরোগ (হাঁপানিতে), পোকা কামড়ালে রক্তপাতে প্রচুর কাজ দেয়। সুষনি ভারতের বহু প্রদেশে বিশেত, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল প্রদেশের (বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম) জলাভূমিতে, ধানখেতে, পুকুরের বকচরে জন্মায়। এর প্রচলিত বঙ্গদেশের নাম সুষনিশাক। গ্রামাঞ্চলে এর ডাকনাম 'ঘুম শাক'।

ওড়িশা প্রদেশে এর সাধারণ নাম 'ঘুন্‌ঘুনিয়া', হিন্দিভাষী অঞ্চল এর নাম 'চৌপতিয়া', এই নামটি কিন্তু আসলে সংস্কৃত চতুষ্পত্রীর বিবর্তিত শব্দ নাম। ভূমি প্রসারণী লতা হলেও লতানালের পর্ব থেকে শিকড় মাটিতে প্রবেশ করে বিস্তারলাভ করে। এর শিকড়ের মাঝে মাঝে গ্রন্থি আছে, ক্ষীণ পত্র একত্র মিলিত। শীতকালে এর বীজ হয়। সব প্রদেশে মানুষই আহার্য শাক হিসেবে এর পাতা রান্না করে খেয়ে থাকেন।

এই চোদ্দোশাকের প্রতিটি গাছ এককভাবে বহু রোগ প্রতিরোধ করে। এ সবই নিছক কুপ্রথা নয়, বিজ্ঞানভিত্তিকও বটে। ভূতচর্তুদর্শী দিনটি প্রারম্ভিক সূচনা, আসলে ওই একটি দিন মাত্র চোদ্দোশাক খেয়েই ব্রত পালন উদ্‌যাপন নয়, প্রতিদিন শাকপাতার দুটি-তিনটি বা কয়েকটি মিলিয়েও খাওয়া উচিত। এতে সুগার, কোলেস্টেরল, প্রেসার, থাইরয়েড, হার্ট অ্যাটাক, সেরিব্রাল স্ট্রোক, করোনা ও মারণ রোগ ব্যাধির অব্যর্থ প্রাকৃতিক প্রতিষেধক। ☐

বহুবার নাম বদল হয়েছে শ্রীশ্রী মা বোল্লা রক্ষাকালীর

দেবব্রত রায়

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা গ্রামের রক্ষাকালী পূজা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কালীপূজা। সারা বছর ধরে মায়ের থানে পূজা হলেও প্রত্যেক রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার সাড়ে সাত হাত মাটির প্রতিমা দিয়ে মায়ের বার্ষিক পূজা হয় এবং সোমবার গোধূলিতে প্রতিমা বিসর্জন হয়। দেশ-বিদেশ থেকে কয়েক লক্ষাধিক ভক্তের আগমন হয়। ভক্তরা মাকে ফুল, ফল, বাতাসা, মিষ্টি, পায়রা, পাঁঠা, সোনা-রুপার গয়না নিবেদন করেন। মায়ের বার্ষিক পূজায় বিরাট মেলা বসে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, রক্ষাকালী মা খুবই জাগ্রত, মায়ের কাছে কেউ কিছু মানত করলে তাঁর মনস্কামনা অবশ্যই পূরণ হয়। বোল্লার রক্ষাকালী মা আদিতে ফলহারিণী কালী নামে পূজিত হতো। জনৈক তন্ত্র সাধক বঙ্গীয় ১১৫৮-১১৭৭ সালের কোনো এক বছর থেকে মায়ের পূজা শুরু করেন। সেই থেকে তন্ত্র মতেই মায়ের পূজা হয়। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের কলেরা মহামারিতে বোল্লা গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মারা গেলে গ্রামবাসী কালী মায়ের শরণাপন্ন হয়। এরপর মায়ের কৃপায় গ্রামবাসী সড়কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় 'মড়কাকালী' নামে মা পরিচিতি পায়। ১৩১৭ বঙ্গবাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের বার্ষিক পূজার রাতে (ফলহারিণী অমাবস্যা) প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে মন্দির ব্যবহারের অযোগ্য হলে মায়ের পূজা বন্ধ থাকে। হঠাৎ একদিন সকালে গ্রামবাসীরা মায়ের পাথরের থানটিকে পাশের পুকুর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখে এবং সেটিকে মন্দিরের যথাস্থানে স্থাপন করে। তিন বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় মায়ের পূজা চালু হয়। আর একবার মায়ের থান মন্দিরের বাইরে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামের বসন্ত কুমারী দেবী এবং তিনি সেটিকে যথাস্থানে রাখেন। তখন থেকে আজ অবধি আর কখনো মায়ের থানের স্থানচ্যুতি ঘটেনি।

এরপর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে এক শুক্রবারের হাটের গণ্ডগোলে জমিদার মুরারীমোহন চৌধুরী-সহ মোট ১২ জন গ্রামবাসীর নামে মামলা হয়। তাঁরা গ্রেপ্তার হন এবং এক বছরের বেশি সময় কারাবাসে রেখেই বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। গ্রামবাসী মড়কাকালী মায়ের কৃপা প্রার্থনা করেন। মায়ের কৃপায় আসামিরা মুক্তি পান ১৩৩০ বঙ্গাব্দের রাসপূর্ণিমার কয়েকদিন আগে। মামলায় নিশ্চিত সাজা থেকে রক্ষা করার জন্য মড়কাকালী মা 'রক্ষাকালী' নামে প্রতিষ্ঠা পায়। মন্দির সংস্কার হয় এবং খড়ের বদলে টিনের চাল হয়। গ্রামবাসীরা জ্যৈষ্ঠ মাসের বার্ষিক পূজা অবধি অপেক্ষা না করে রাসপূর্ণিমার দিনই ঘটা করে মায়ের পূজার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখন পার্শ্ববর্তী সৈয়দপুর গ্রামে রাসের বিরাট উৎসব হতো, তাই রাসপূর্ণিমার পরে গ্রামের হাটবার অর্থাৎ শুক্রবার মায়ের পূজার দিন স্থির হয়। শুক্রবার দিনটিই বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল হাটের জন্য গ্রামে অনেক লোক সমাগম হবে এবং মায়ের মহিমা ও পূজার কথা বেশি প্রচার পাবে। সেই বছর থেকেই বারোয়ারিগতভাবে আড়ম্বরে মায়ের পূজা হতে থাকে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের বার্ষিক পূজা বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকে শুক্রবার পূজার পরে শনিবার গোধূলি বেলায় মন্দির সংলগ্ন পুকুরে মায়ের প্রতিমা ভাসানের প্রথা প্রথম চালু হয়। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ থেকে শনিবারের পরিবর্তে সোমবারে ভাসানের প্রথা চালু হয়। মায়ের ৮৪ ফুট উচ্চতার কংক্রিটের বর্তমান মন্দিরটির ১৩৮২ বঙ্গাব্দে ভিত পূজা হয় এবং ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বোল্লার 'রক্ষাকালী' মা বর্তমানে 'বোল্লাকালী' নামেই মানুষের কাছে সুপ্রসিদ্ধ।

পথ নির্দেশ : মালদা-বালুরঘাট জাতীয় সড়কের বোল্লা বাসস্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণে ৫০০ মিটার দূরত্বে মায়ের মন্দির।

বাৎসরিক পূজা ২০২৩ : ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ (ইংরেজি ১ ডিসেম্বর, ২০২৩)।

মালদা জেলার প্রাচীনতম ও জাগ্রত কালী

মালবিকা ঠাকুর

মালদা শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে রতুয়া দু' নম্বর ব্লকের অন্তর্গত গোবরজনা গ্রাম। এই এলাকায় অবস্থিত দেড় বিঘা জমির উপর স্থাপিত মা গোবরজনা কালী মন্দির। একসময় ঘন জঙ্গলে ঘিরে ছিল এই এলাকাটি। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কালিন্দ্রী নদী। কথিত, দেবী চৌধুরানী উপন্যাস খ্যাত ভবানীঠাকুর ও দেবী চৌধুরানী বজরা করে নদীর পথে উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার পথে নদীতে বজরা আটকে যায়। তারপর সেইস্থানে তারা রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের পূজা দেন। পূজা দেওয়ার পর তাদের বজরা চলতে আরম্ভ করে।

অনেকে অবশ্য এই মত বিশ্বাস করেন না, অনেকে দাবি করেন ভবানীঠাকুর আসার আগে থেকে এ পূজা রাজপুতদের শুরু করা। এখন এই পূজার দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন এই গ্রামেরই এক সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবার। বর্তমানে এটি পারিবারিক পূজায় আবদ্ধ না থেকে পেয়েছে সর্বজনীনতার ছোঁয়া। পূজার আগের দিন থেকে শুরু হয় মেলা। পূজা উপলক্ষ্যে এই মেলা চলে কয়েক দিন। বলি হয় প্রায় ছ' হাজারেরও বেশি। বলির রক্তে ভিজে যায় মন্দির প্রাঙ্গণ। শুধু মালদা জেলায় নয়, ভক্ত আসেন অন্য রাজ্য থেকেও। নিরাপত্তায় মোড়া থাকে পুরো এলাকা। লক্ষাধিক মানুষের ভিড়ে মন্দির নতুন রূপ পায়। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। পূজার শেষে পরের দিন জাঁকজমক ও মহাসমারোহে মাকে মন্দিরে চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করানোর পর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কালিন্দ্রী নদীতে বিসর্জন করা হয়।

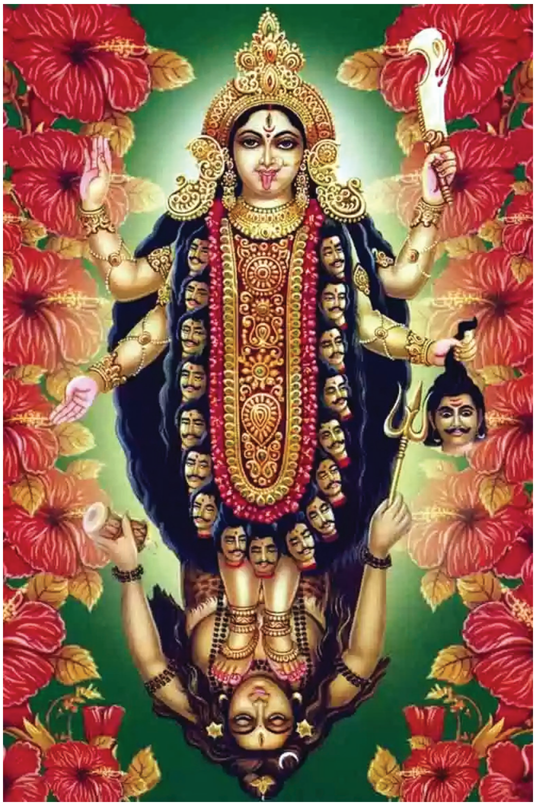

শক্তির দেবী এবং শক্তি সাধনার সাহিত্য-কথা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'মনোময়ী কালী' বিষয়ে একটি কথা আছে। মানুষের মনের মধ্যেই এক বিপুল শক্তির আধার, একটা বিপুল আলোড়ন চলে; দৈবীরূপের মধ্যে আমরা তারই প্রতিচ্ছবি দেখি। দেবী কালী কৃষ্ণবর্ণা, তিনি ভয়াল, ভয়ংকরী, উলঙ্গিনী, খড়্গাধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী। এই ভয়ংকরী কালী মানুষেরই ভয়ংকর বাসনা-সৃষ্টি, যা আমাদের শত্রু নিধনে প্রেরণা দেয়। সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি এই মহাকালী; শায়িত শিবের দৃষ্টির সঙ্গে মহাকালীর নয়নের মিলনে শিবশক্তির উন্মোচন। পদদলিত হয়েও প্রেমাবিষ্ট নয়নের সম্মিলন।

'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি
চিনিতে পার কি না।...
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু
একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো
দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।'

(সাগরিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শান্তি প্রতিষ্ঠা কীভাবে :

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রুদ্র ও রুদ্রাণীর যোদ্ধৃত্ব রূপের সম্মিলন দরকার। মহাকাল ও মহাকালীর মিলন প্রয়োজন। শান্তি তো অত্যাচারীও দিতে পারে। কিন্তু সে শ্মশানের শান্তি! প্রতিরক্ষার শান্তি যদি চাও তবে অসুর বধ করতে হবে, দিতে হবে রক্তের মান। প্রতিটি হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণ থেকে, প্রতিটি যোদ্ধার রক্ত ক্ষয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে প্রতিরক্ষার শান্তি আসে। তাতে উত্তরসূরীও নিজেকে তৈরি করতে পারে পরবর্তী প্রজন্মে রক্তক্ষয়ের ভাবনা। এইভাবেই ঐতিহ্যের অনুবর্তনে আসে শান্তি।

দেবী দুর্গার যোদ্ধৃত্ব রূপ :

দেবী দুর্গা দশভুজা, দশ প্রহরণধারিণী; সিংহবাহিনী, সর্বশক্তিদায়িনী; বলপ্রদায়িনী, শক্তিস্বরূপিণী ভীমে। আমরা তারই শক্ত্যংশজাত সন্তান। তিনিই চামুণ্ডারূপিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, কৃপাণপাণি, অসুরবিনাশিনী দেবী। শাস্ত্রীয় রূপেই এই দেবীর বন্দনা করি, পুতুল পূজার অনুসারী নই আমরা।

মধু (Divine Health Drink) পান করছেন দেবী দুর্গা। আর মহিষাসুরকে বলছেন, 'গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবামহ্যম্।' রে মূঢ়, রে অজ্ঞ, যতটা সময় আমি মধু পান করছি, ততটা সময়ই তুই গর্জন কর। খুব তাড়াতাড়ি আমার দ্বারা তুই নিহত হলে দেবতারা তৎক্ষণাৎ হর্ষধ্বনি করবেন। দেবীর এই কনফিডেন্স কী জন্য হয়েছিল? কারণ সমস্ত দেবতার সমন্বিত তেজরাশি থেকে দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হয়েছিলেন, দৈবশক্তির সম্মিলিত রূপ তিনি, দেবী তেজোবতী। দেবীর মুখমণ্ডল নির্মিত হয়েছিল মহাদেবের তেজে, কেশের সৃষ্টি যমরাজের তেজে, দেবীর বাহুযুগল তৈরি হয়েছে বিষ্ণুর তেজে, চন্দ্রের তেজে রূপলাভ করেছে তাঁর স্তনযুগল, মধ্যাংশের সৃজন ইন্দ্রতেজে, ঊরু-জঙ্ঘার সৃষ্টি বরুণের তেজে, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যের তেজে পদাঙ্গুলি, বসুর তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, অগ্নির তেজে ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূ আর বায়ুর তেজে কর্ণ। বার্তা এই, যথার্থ শক্তিশালী জাতি তৈরি করতে তার নানান কৌমগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে হবে।

নানান দেবতার মারণাস্ত্র পেয়েছিলেন দেবী; মহাদেব দান করেছিলেন শূল, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র, বরুণ দিয়েছিলেন শঙ্খ, অগ্নির কাছ থেকে পেলেন শক্তিশেল, বায়ু দিলেন তূণ, ইন্দ্র দিলেন বজ্র আর ঘণ্টা, যমরাজের কাছ থেকে লাভ করলেন কালদণ্ড, ব্রহ্মা দিলেন রুদ্রাক্ষমালা ও কমণ্ডলু আর মৃত্যুদেব দিলেন খড়্গ ও ঢাল। সব দেবতার তেজে, সব দেবতার অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে দেবী দুর্গা অসুরের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হলেন আর সেইসঙ্গে স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো দেব-রাজ্য। সনাতনী ভারতবর্ষে হিন্দুর যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে তার মানবসম্পদ ও শৌর্যবীর্য একত্রিত হলেই হিন্দুরা যে কোনো বহিরাগত ও অ-হিন্দুর অন্যায্য আক্রমণকে প্রতিহত করতে

ফঃ ৫

পারবে। দুর্গাপূজায় দেবী আমাদের মধ্যে সেই চিরন্তন চৈতন্যের উদয় ঘটাবেন, এটাই দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য!

শাস্ত্রবিরোধিতা শস্ত্রহীন মূর্তিতে, থিমপূজায় :

অতএব শস্ত্রহীন দুর্গা শাস্ত্রবিরোধী। এমন অবয়ব নিতান্তই পুতুল হবে, ছবি আঁকলেও তাই। তাই শাস্ত্র মেনেই প্রতিমা হওয়া উচিত। হিন্দুকে দিয়ে এমন পুতুল গড়িয়ে পৌত্তলিক বলে তাদেরই গালাগালি দেওয়া এক নতুন মজা। আমরা যেন শিল্পের ও শিল্পীর স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বোকা বনে না যাই। শক্তির সমন্বিত রূপ চাই। শক্তি ও সুন্দরের যাবতীয় ভাণ্ডার দেবী দুর্গার মধ্যে নিহিত। এটাই বাঙ্গালি দুর্গাপূজায় পাঠ করুক, পাঠ করুক দুর্গাস্তোত্রের টেক্সট। আর নিমেষে শক্তিমান হয়ে অশুভশক্তির টুঁটি চেপে ধরুক।

আদ্যাশক্তিই যখন দেশমাতৃকা :

বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনা থেকেই একদিন বঙ্গীয় যুবকদের শক্তির উৎসকে খুঁজে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ। তখন ব্রিটিশ যুগ। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।' দেশমাতাকে দেবী দুর্গাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। বন্দেমাতরম মন্ত্রে যে দেশমাতা, তিনি যেন দেবী দুর্গারই অন্যতর রূপ। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি/হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।।/ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/কমলা কমল দল-বিহারিণী'। যে বঙ্গভূমি তন্ত্রের পীঠস্থান, যেখানে আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, যেখানে ভগবান মাতৃরূপে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হন, তারই আদলে দেশমাতৃকাকে দেখায় চৈতন্য হলো। ভারতমাতার সামনে সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশমাতাকে রক্ষা করার পুণ্য শপথ নিলেন দেশব্রতী মানুষ। দেবীকে অর্ঘ্য সমর্পণ করে ধ্যান করা হলো অখণ্ড ভারতবর্ষ রূপে, স্মরণ করা হলো তাঁর চিন্ময়ী ভৌম রূপ, সে আরাধ্য মূর্তি যেন দশভুজা দুর্গা। ভারতমাতার পূজা মানেই রাষ্ট্রীয় বেড়া বাধার ব্রত, দেশকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলার ব্যায়াম, ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী গড়ে তোলার রাখিবন্ধন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ। যে মাটি আমাদের খাদ্যের ভাণ্ডার, যে মাটিতে আমাদের পদচারণা, যে মাটির বুকে আমাদের বসতি, তারই চিরন্তন-চিন্তনই ভারতমাতার পূজা। মাটিই মা, মাতৃকা আরাধনার চরম দার্শনিকতা হলো ভারতমাতা। ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, পৃথিবীর ঠাকুরঘর; এই দেশ কেবল আমাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানই দেয়নি, দিয়েছে এক অচিন্ত্য বিস্ময়—'Each soul is potentially divine.' ভারতবাসী অমৃতের সন্তান, পুণ্য-পবিত্র।

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র :

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখলেন 'দুর্গাস্তোত্র', শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্বের রচনা। দুর্গাস্তোত্র ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী সনাতনী-চিন্তক প্রবুদ্ধজনের কাছে একটি অন্যতম সৃষ্টি, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী যুবকবৃন্দের জপমন্ত্র। দেবী এখানে দেশজননী। স্তোত্রটি 'মানব-আস্পৃহার শ্রেষ্ঠতম সম্ভার'। তিমিরবিনাশী আভায় সমষ্টিগত প্রগতির পথ হিসেবেই স্বীকৃত। এই দেবী বিসর্জনের জন্য নয়, 'বীরমার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জ্জন করিব না।' অখিল জীবনে তাই অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা।

প্রেক্ষাপট বঙ্গদেশ হলেও, বঙ্গদেশের তরুণদলের একাত্ম প্রার্থনা হলেও, তা আসলে ভারত-বাণী; তা আসলে বিশ্ববোধ। বঙ্গভূমি অতিক্রম করে ভারতমাতা হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন জগদম্বে। আজও যখন বাঙ্গালি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে জাতীয় বিকাশের ধারাপাতে, নানান চোরাস্রোতে তলিয়ে যাচ্ছে তার যাবতীয় ক্ষাত্রবল, ভীরু-পলায়নপর জাতি হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে অনুক্ষণ, তখন বাঙ্গালি যেন পুনর্পাঠ করে দুর্গাস্তোত্রের টেক্সট।

ভারতমাতা যখন মহাকালী :

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮১) উপন্যাসে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারার উদ্ভব হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে সেই ক্ষীর প্রবাহিত হয়ে পরিপুষ্টি লাভ করল। ডি.এল. রায়ের নাটকে দেখা যায় মোগলদের বিপ্রতীপে দেশের পীড়িত ধর্মকে রক্ষা করতে হবে, হিন্দুস্থানের বিপন্না জননী-জায়াকে রক্ষা করতে হবে, রক্ষা করতে হবে লাঞ্ছিত ভারত নারীকে। সেজন্যই সমরে রণসাজে যেতে হবে।

'চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী!'

এখানে ভারতমাতার স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। ভারতমাতার সন্তানেরা কোষনিবদ্ধ তরবারি নিয়ে লড়াই করবেন। যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালির হৃদয়ে মাকালীর দ্বিবিধ রূপ— অভয়া-বরদা রূপে মাতৃরূপা; আর খড়্গামুণ্ডধারিণী রূপে মৃত্যুরূপা। কালীকল্পনার মধ্যেকার সংগ্রাম ও মৃত্যু বাঙ্গালির মধ্যে এক মৌলিক প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে।

স্বামীজী বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। এই মাতৃতন্ময় বিবেকানন্দ লিখলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শাক্তকবিতা 'মৃত্যুরূপা মাতা' (Kali the Mother); যা দুর্বলের, কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়, শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ এবং প্রগাঢ় মানসিক অভিভব—

'Who dares misery love,
And hug the form of death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.'

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।'

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজী লিখছেন, 'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন/শিয়রে সমন, ভয় কি তোমার সাজে?' জগজ্জননীর অনন্তলীলার তল তখনই পাওয়া যায়, যখন আমাদের স্বার্থ, সাধ, মান চূর্ণ হয়ে গিয়ে হৃদয় হয়ে ওঠে শ্মশান। আর তাতেই নাচে শ্যামা মা। এই মৃত্যুরূপা কালী আরাধনা না করলে যুদ্ধে জেতা যায় না। ধর্মরক্ষার যুদ্ধে সনাতনী হিন্দুকে জিততেই হবে এবং তা বীরের মতো, বীর সন্ন্যাসী হয়ে। ◘

সাধক কমলাকান্তের কালী সাধনা

শেখর সেনগুপ্ত

আমার বাল্য ও যৌবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়েছে বর্ধমানের প্রায় গ্রামাঞ্চল তেজগঞ্জে যেখানে আজও মুখ্য আকর্ষণ বিদ্যাসুন্দরের কালীমন্দির। যেহেতু স্বভাবে আমি কিঞ্চিৎ গেছো, তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহর বর্ধমানের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। ছাত্রও তো ছিলাম বর্ধমান রাজ কলেজ এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের। কখনও প্রায় যেন সিটি দিতে দিতে সবান্ধব চলে গিয়েছি বিজয় তোরণের তলায়, উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারে সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরে এমনকী কালেভদ্রে হানা দিয়েছি সেই এক আশ্চর্য বিশাল বাগিচায়, সেখানে রয়েছে পর পর মোট ১০৮টি শিবমন্দির। আর যেতাম বর্ধমানের বোরহাট এলাকার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাধক কমলাকান্তের কালীমন্দিরে এবং সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো। তখন একেবারে অন্য মানুষ, যার স্বভাবে আর ডানপিটেমোর স্থান নেই। বয়ঃসন্ধিতেও মন স্থিরবদ্ধ হয়ে থাকে মায়ের শ্রীচরণে। খালি পা, গোটানো ধুতি পুরোহিত যখন প্রসাদের থালা হাতে এগিয়ে আসতেন, আমার প্রশান্তি আরও ব্যাপ্ত হতো। মন থেকে বেয়াড়া বাসনা সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত। ছাত্রজীবনের অবসান্তে শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, আচম্বিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকে পড়া।

ওই সময়ে আমি সাধক কমলাকান্তকে নিয়ে কিছু চর্চাও শুরু করেছিলাম। পুরো নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। জন্ম বর্ধমান জেলার কালনায়। পাড়ার নামটা একটু বিচিত্র— বিদ্যাবাগীশ। জন্মেছিলেন ১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে (জন্মের দিন-ক্ষণ কিন্তু কেউই বলতে পারছেন না)। জনক মহেশ্বর ভট্টাচার্য, জননী মহামায়াদেবী। বাল্যে পা রাখাবার আগেই পিতৃহারা। প্রতিপালিত মাতুলালয়ে। এলাকায় মন্দির ও মসজিদের সহাবস্থান। বিরোধ নিতান্ত অচিরস্থায়ী সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা, দুপুরে মসজিদের আজান। মাতুলালয়ের অদূরে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। ওখানেই দিনের অনেকটা সময় কাটাতেন বালক কমলাকান্ত। এলাকার গণ্যমান্যরা আসতেন মন্দিরে, যাঁদের মধ্যে একজন আবার এগজিকিউটিভ র‍্যাংকের অফিসার। তিনি বালক কমলাকান্তকে স্নেহ করতেন এবং বলেছিলেন, 'এই ছেলের মধ্যে যে ভক্তি ও বিদ্যা রয়েছে, তার প্রভাব ক্ষণপরিণামী হবে না।' অচিরে কালীসাধক বালকরূপে কমলাকান্তের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভেই সেই বিশালাক্ষীদেবীর মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসন নির্মাণ করে কমলাকান্ত সেখানে ধ্যানে বসতে শুরু করেন। ওখানে তাঁর সিদ্ধিলাভ। বিশালাক্ষী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তাবৎ তান্ত্রিক বিধি মেনে। প্রশস্ত বেদিতে দাঁড়িয়ে আছেন তন্ত্রসাধনার পাঁচ দেবী— এণাক্ষী, দ্বিরাক্ষী, বিশালাক্ষী, রক্তাক্ষী ও সুলোচনা। গ্রাম চান্না ও পাড়া বিদ্যাবাগীশ বিখ্যাত হয়ে ওঠে সেই মন্দিরের জন্যই। আজ সেই এলাকার খ্যাতি সাধক কমলাকান্তের জন্মস্থান এবং সার্থক সাধনা লাভের জন্য। বলা হয়, ওখানে গিয়ে একবার দাঁড়ালে কারোর আর ধর্মে ও ভক্তিতে অনাস্থা থাকে না। কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে লেখা রয়েছে :

সাধকপ্রবর শ্যামাপদ পঙ্কজ
সেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্তস্যা
ত্রৈবাজী দদ্বিম।।

সেই পঞ্চমুণ্ডীর সাধনস্থানটিকে প্রথম প্রথম রক্ষা করা হতো একেবারে আলতো ভাবে। পরে স্থানীয় জমিদারের ভক্তিযুক্ত বদান্যতায় স্থানটির রূপান্তর ঘটে। তৈরি হয় একটি ছোটো মন্দির। ইঁটের দেওয়াল। আমি যখন প্রথম সেই মন্দিরে যাই, দেখতে পেলাম, সর্বস্তরের ভক্তদের আনাগোনা— ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের মধ্যে কোনও তারতম্য করা হচ্ছে না। অবিরাম মানুষ আসছে, যাচ্ছে। এখানেই রয়েছে সাধক কমলাকান্তের ভৈরবতলা। অদূরে একটি পুকুর। পরিচ্ছন্ন জল টলটল করছে। কোনও হল্লা নেই। প্রায় সকলেই নিশ্চুপ। কমলাকান্তের হৃদয় মথিত-করা স্মৃতি, কত অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী এই স্থান। আমরা যাই মা কালী এবং সেই সাধককে প্রমাণ করতে।

সাধক কমলাকান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য আমি পেয়েছিলাম বর্ধমান শহরের দু'জন বিখ্যাত চিকিৎসকের কাছ থেকে। একজন স্কিন স্পেশালিস্ট ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অন্যজন

উত্তরফটকের প্রতিভাদীপ্ত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ অনন্ত কুমার দাশগুপ্ত। বাল্যে কমলাকান্ত যেমন ছিলেন দুরন্ত, তেমনি মেধাবী। মা বিশালাক্ষী তাঁকে দিয়েছিলেন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তিও। তাঁর মুখনিঃসৃত সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ শুনে স্কুলের শিক্ষকদের সময় সময় ঘটে যেত আক্কেলগুড়ুম। বহু ঘটনা আছে, যা সাজিয়ে লেখা সহজকর্ম নয়। একবার বিশালাক্ষীর পুকুরে দেখা গেল একটি প্রাণহীন দেহ ভাসছে। লোকেরা সেই দেহটিকে ওপরে নিয়ে এলে ঘটতে থাকে অবিশ্বাস্য ঘটনা। মৃতের কালো ত্বক হয়ে উঠছে শ্বেতবর্ণ। মৃতের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে প্রাণ এবং দেখা গেল, তিনি আর কেউ নন, তিনি যে স্বয়ং সাধক কমলাকান্ত। উঠে দাঁড়িয়েই চলে গেলেন মন্দিরে এবং মা কালীকে শোনাতে থাকেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান :

মন, তুমি দেখো আর আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।

স্বয়ং শ্যামা মা একাধিকবার তাঁকে দেখা দিয়েছেন, গান শোনাতে বলেছেন এবং অচিরে কমলাকান্ত ভক্তিগীতির এক অসাধারণ শিল্পীরূপে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। তাঁর সকল সংগীতই শ্যামাসংগীত। যাঁরাই তাঁর গান শুনেছেন, তাঁরা প্রবেশ করেছেন নতুন এক ভক্তিস্নাত ভুবনে। সাধক কমলাকান্তের সেইসব গানগুলির মধ্যে আমি এখানে মাত্র তিনটিকে তুলে ধরলাম :

১

তবে চঞ্চল হয়েছে আমার মন
কেন অকারণ।
করো পূর্ণ আশা দুঃখনাশা
মায়ের ওই দুটি শ্রীচরণ
অপার সংসারে কতবার পড়েছ বটে
যখন বিপদ ঘটে, কালী করে নিবারণ।।

২

জানো যারে মন পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ,
কখনো কখনো পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে আসি
ক্ষুদ্র তনয়ে আসে ভয়
কভু বন্যপুরে আসি বাজাইয়া বাঁশি
ব্রজঙ্গনার মন হারিয়ে লয়।।

৩

যেমন কালী তেমনি উপায়
কালীনামের জোর ঘণ্টা বাজায়
তারা নামের বলে যে জন চলে
সে কারে তা ডক্কার জোরে।

কমলাকান্তের ছিল অসাধারণ মেধা। অমন মেধাবী কালীসাধক অদ্বিতীয়। একাধারে যেমন শ্যামামায়ের সঙ্গে কথা বলেন অনর্গল, অন্যদিকে তেমনি শ্যামামায়ের নির্দেশেই বিবাহ করেন। সাংসারিক দায়িত্ব পালনে তাঁর সচেষ্টতা ছিল লক্ষণীয়। ছিলেন টোলের শিক্ষক, অনন্য সাধক-গায়ক। গানগুলি সবই স্বরচিত এবং সুর নিজস্ব। গুণের শেষ নেই। পারিবারিক জীবন অবশ্য পূর্ণতা পায়নি। স্ত্রীর অকালমৃত্যু তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। বেদনাহত কমলাকান্ত সেদিন শ্যামামায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন :

কালী। সব ঘুচালি লেঠা,
শ্রীনাথে লিখন, আছে যেমন,
রাখবি কি, না রাখবি সেটা।

কমলাকান্তের গান, বিদ্যা ও ভক্তির সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বয়স যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ, বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদের লোকেরা কমলাকান্তের কাছে ঘনঘন আসা-যাওয়া শুরু করে দিলেন। তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক রাজা কমলাকান্তকে রাজসভায় সভাকবির পদে অভিষিক্ত করলেন। সিংহাসনে তখন এসে বসেছেন তেজচাঁদের পুত্র প্রকাশচাঁদ। প্রতাপচাঁদ কিন্তু মানুষ হিসেবে আদৌ সুবিধের নন। লম্পট, বিবেকহীন, অহংকারি। এহেন প্রতাপচাঁদ একদিন হানা দিলেন কমলাকান্তের কালীবাড়িতে। সেখানে কমলাকান্তের শ্যামাসংগীত শুনে মুগ্ধ। কমলাকান্ত তাঁর মাথায় হাত রাখতেই একেবারেই বদলে গেলেন বর্ধমানের সেই নবীন মহারাজা। দুরন্ত ও লঘুচিত্তের মানুষটি সমানে কাঁদতে থাকেন। কমলাকান্তের চরণে লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর বর্ধমানবাসীরা পেয়ে গেলেন এক চরিত্রবান, সকলের জন্য হিতকামী রাজাকে। রাজা প্রতাপচাঁদই সাধক কমলাকান্তের জন্য কোটালহাটের কালী মন্দিরকে করে দেন বর্ণময়। বারো কাঠা জমিও বরাদ্দ হলো। নির্মিত হলো নতুন পঞ্চমুণ্ডীর আসন। কমলাকান্তের অলৌকিক শক্তির কথা বিরাট ব্যাপ্তি পেলো ভারতব্যাপী। তখন কাশীর রাজা চৈত সিংহ সাড়ম্বরে কমলাকান্তকে নিয়ে এলেন বারাণসীতে। ঠিক ওই সময়েই কাশীতে শুরু হয়ে গিয়েছিল কলেরার মহামারি। কাতারে কাতারে কাশীবাসী প্রাণ হারাচ্ছেন প্রতিদিন। কমলাকান্ত তখন কাশীতে গঙ্গার মুন্সীঘাটে মা কালীর পূজা করলেন ধুমধামের সঙ্গে। তিনি যখন গান গাইছেন, মৃন্ময়ী মূর্তির বুক চিরে বেরিয়ে আসে লাল রক্ত। শ্যামামায়ের অভয়বার্তাও ধ্বনিত হয় সেই ক্ষণে, 'সকলে অতঃপর কাশীতে থাকবে নিরাপদে।' প্রকৃতই কাশী রেহাই পেলো মহামারির দাপট থেকে। কমলাকান্ত শিবহীন শ্যামামায়ের দিকে চেয়ে গাইতে থাকেন :

নাচ গো শ্যামা, নাচ।
অন্তরে মোর সদানন্দময়ী নাচ।
আনন্তে নিরাপদে থাকুক জন
তোমার চরণে রাখি প্রতিক্ষণ।।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের এই মহাসাধকের তিরোধান ঘটে বর্ধমান শহরে। খবর পেয়ে বর্ধমানের মহারাজা ছুটে এসেছিলেন। স্বয়ং শামিল হন সাধকের শেষযাত্রায়। কোটালহাটের মন্দিরে সমাধিস্থ হলো কমলাকান্তের চিতাভস্ম। ওই সমাধির ওপরই দাঁড়িয়ে অপূর্ব কালীমূর্তি। আনা হয়েছিল বারাণসী থেকে। উচ্চতায় ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। কষ্টিপাথরে নির্মিত। পদতলে শায়িত শিব। প্রসঙ্গত জানাই, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায় কমলাকান্ত এবং রামপ্রসাদকে সমাসনে স্থান দিতেন এবং গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠতেন দুই সাধকের গানই।

তথ্যসূত্র :

১. বৃহৎ তন্ত্রসার --- আগমবাগীশ।
২. বর্ধমানের সাধকগণ— অজিত ভট্টাচার্য।
৩. হিন্দুদের তীর্থ পরিক্রমা— অরুণ মুখোপাধ্যায়।

ব্যক্তিগত ঋণ :

ডাঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়,
ডাঃ অনন্তকুমার দাশগুপ্ত।

বঙ্গ কন্যার শিল্পকর্ম বিদেশে পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খাঁচায় বন্দি জীবন কখনোই সুখের হয় না। কেবল স্বাধীনতার মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে প্রকৃত শান্তি। যেখানে আমরা নিজেদের ইচ্ছায় নিজেদের মতো করে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারি। বিশিষ্ট বাঙ্গালি চিত্রশিল্পী স্বাতী ঘোষের আঁকা 'স্বাধীনতা ও শান্তি' বিষয়ে সাদা পায়রার ছবিতে ফুটে উঠেছে সেই স্বাধীনতার চিত্রই।

ইতালির মিলানের ব্রেরাতে 'এল আর্টে স্ফিদা ইল টেম্পো আর্ট অ্যান্ড মোড' নামে জমকালো এই প্রদর্শনীতে অতিথি শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন স্বাতী। ইতালির মিলানিজ গ্যালারিতে স্বাতী ঘোষের আঁকা সাদা পায়রার অসাধারণ তৈলচিত্র কাপড়ে ছাপিয়ে সেই কাপড় পরেই ফ্যাশন শো-তে পা মেলালেন ইতালীয় তরুণী। পরিচালক রোসেলি ক্রেপালদি আয়োজিত ফ্যাশন শো-তে এই শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা পোশাকটি পুরস্কৃত হয়, যা দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ।

রোমের মাইক্রো আর্টি ভিসিভ গ্যালারিতে গত ৩১ মার্চ শেষ হয় এক বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী। সেখানে গৌতম বুদ্ধের পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখিত শান্তি স্থাপনের উপায় নিয়ে তৈরি শিল্পকর্ম 'নির্বাণ' অ্যাক্রেলিক চিত্রের জন্য চিত্র শিল্পী স্বাতী ঘোষকে তৃতীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় মার্গারিটা ব্লোনেস্কা সি আর ডি -র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে। 'তামারা ডি লেম্পিকা'— এই পোলিশ শিল্পীর নামাঙ্কিত পুরস্কার স্বাতী ঘোষের হাতে তুলে দেওয়া হয় রোমের সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং পোল্যান্ডের ইতালীয় দূতাবাসের সহযোগিতায়।

কলকাতার বাসিন্দা স্বাতী ঘোষের ছবি বহুবার বিদেশের মাটিতে সমাদৃত হয়েছে। ইতালির মিলানেই গত বছর শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় স্নাই সানসিরো ইপোড্রোম রেস কোর্সের প্রদর্শনশালায় একমাত্র ভারতীয় শিল্পী হিসেবে স্বাতী জিতে নেন 'দ্য আর্ট অ্যান্ড ক্যাভালো ট্রফি'। ২০২২ সালের ২৪ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত তৈলচিত্রটির নাম— 'পাওয়ার অব এনার্জি'। প্রখর দ্যুতি বিচ্ছুরণরত সূর্যের সামনে সাতটি ঘোড়ার ছবি এই তৈলচিত্রটিতে আঁকা হয়েছে। সূর্য পৃথিবীর সব জৈবিক বস্তু দ্বারা সংগৃহীত শক্তির উৎস, যা পৃথিবীতে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখে। সূর্যালোকের সাতটি রঙের বর্ণালি পৃথিবীকে আলোকিত করে, অন্ধকার নাশ করে। সাতটি ঘোড়া শক্তিরই এক ভিন্ন অভিব্যক্তির দিক্‌নির্দেশ করে। সাতটি রঙের বর্ণালী স্বরূপ এই সাতটি ঘোড়ার মাধ্যমে সূর্যের শক্তির প্রতিফলন— শক্তি ও সশক্তিকরণের এই চিরন্তন তত্ত্বটি এই ছবিটির মাধ্যমে প্রতিভাত হচ্ছে।

মিলানিজ গ্যালারি ও ইপোড্রোম ডি সান সিরো-র যৌথ সহযোগিতায় হওয়া এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় কনসাল জেনারেলের উপস্থিতিতে একমাত্র ভারতীয় শিল্পী হিসেবে এই পুরস্কার জিতে নেন স্বাতী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ ও পুত্র প্রিয়াংশু ঘোষ। গত বছরের ২৮ তারিখ এই পুরস্কার গ্রহণ করার পর নরওয়েতে দুর্গাপুজার দিনগুলো অতিবাহিত করে ফের মিলানে ফিরে ইকোনিকা গ্যালারিতে ৪ - ১৩ অক্টোবর আর একটি প্রদর্শনীতে স্বাতী অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁর প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের ওপর আঁকা তেল রঙের আরও পাঁচটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

জামশেদপুরে জন্ম ও কানপুরে বড়ো হয়ে ওঠা, পার্থসারথি রায়চৌধুরী ও পর্ণা রায়চৌধুরীর কন্যা, কলকাতার পণ্ডিতিয়া রোডের বাসিন্দা স্বাতী বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর ফাইন আর্টসে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। এরপরে সিঙ্গাপুর, ইতালি ও স্পেনের বরেণ্য শিল্পীদের অধীনে একাধিক ওয়ার্কশপে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাবা পার্থসারথি রায়চৌধুরী ভালো মূর্তি তৈরি করতেন। মা পর্ণা সুন্দর আল্পনা আঁকতেন। সেই সুবাদে বাবা-মাকে দেখে চিত্রশিল্পের প্রতি স্বাতীর আগ্রহ বাড়ে। তাঁর পেইন্টিঙের রং, বুনন ও শৈলীর জাঁকজমক ও বৈসাদৃশ্য এক ভিন্ন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। স্বাতী শিল্পে বিশ্বাসী। ভারত, নরওয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ভ্যাটিকান চ্যান্সেলারি প্যালেস, নিউ ইয়র্ক, মালদ্বীপ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য গ্যালারি ও জাদুঘরে স্বাতীর কাজ প্রদর্শিত হয়েছে।

স্বাতী জানান, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর শিল্পকর্মের এই সাফল্য তাঁর গুরুদেব শ্রী শান্তিকিঙ্কর লাহা রায়ের আশীর্বাদ। এই পুরস্কার তাঁকে আরও কঠিন পরিশ্রমের পথে উৎসাহিত করবে এবং তাঁর শিল্পীসত্তার অচেনা দিক সমূহকে ভবিষ্যতে উন্মোচিত করতে সাহায্য করবে। তিনি তাঁর এই সাফল্য তাঁর গুরুদেব, তাঁর অভিভাবকদের ও তাঁর পরিবারকে উৎসর্গ করেন। □

সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়

এক গ্রামে এক বোকা লোক ছিল। লোকটির ছিল একটি গাধা। টাকার দরকার হওয়ায় লোকটি তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাধাটিকে বিক্রি করার জন্য পশু কেনা-বেচার হাটে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল, কতগুলো ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে। লোকটি ও তার ছেলেকে গাধা নিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তাদের মধ্যে একজন বলল, আরে দেখেছিস, ওরা কী বোকা। দুজনেই হেঁটে যাচ্ছে, একজন তো গাধার পিঠে চড়ে

যেতে পারে।

গাধার মালিক এই কথা শুনে তার ছেলেকে গাধার পিঠে বসিয়ে দিয়ে নিজে পেছন পেছন হেঁটে চলল। কিছু দূর যাবার পর লোকটি শুনতে পেল, কয়েকজন বৃদ্ধ রাস্তার ধারে বসে কী সব নিয়ে আলোচনা করছে। লোকটি কান পেতে শুনতে লাগল। বৃদ্ধদের মধ্যে একজন বলছে, দেখ দেখ, আমি যা বলছিলাম, ঠিক তাই। এ যুগের ছেলেরা তাদের মা-বাবাকে কোনো সম্মান দিতে জানে না। তাছাড়া তাদের উপর কোনো মায়া মমতা নেই। নাহলে বাবাকে হাঁটিয়ে ছেলে আরামে গাধার পিঠে বসে যায়! ছেলেটিকে তারা আচ্ছা করে ধমক দিয়ে বলল, লজ্জা করে না তোমার? বাবাকে হাঁটিয়ে নিজে আরাম করে গাধার পিঠে বসে যেতে?

ছেলেটি ভীষণ লজ্জা পেল। সে গাধার পিঠ থেকে নেমে বাবাকে গাধার পিঠে বসতে বলল। ছেলের কথাতে তার বাবা গাধার পিঠে উঠে বসল। কিছুদূর যাবার পর তাদের সামনে পড়ল কয়েকজন মেয়ে-বউ। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'দেখেছিস, বুড়োটার কী আক্কেল, নিজে আরাম করে গাধার পিঠে বসে যাচ্ছে আর বাচ্চা ছেলেটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

এবার গাধার মালিক খুব লজ্জা পেল। মেয়ে-বউদের একথা শোনার পর ছেলেকে সে গাধার পিঠে তুলে নিল। কিছুদূর যাবার পর তাদের সামনে পড়ল একজন বলিষ্ঠ লোক। সে দুজনকে ওভাবে গাধার পিঠে বসে যেতে দেখে বলল,

—এই শোনো শোনো, এই গাধাটি কার?

গাধার মালিক বলল, কেন, গাধাটি তো আমার।

— তোমাদের দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

— কেন?

— তোমার নিজের গাধা হলে এই অবলা জীবের ওপর তোমার একটু হলেও মায়া-দয়া থাকত। এমন নিরীহ জীবের পিঠে বসে তোমরা দুজনে যাচ্ছ। এতে গাধাটার কষ্ট হচ্ছে না? যে কষ্ট তোমরা এতক্ষণ এই নিরীহ জীবটাকে দিয়েছ তার জন্য তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

বলিষ্ঠ লোকটির কথায় বাপ ও ছেলে দুজনেই গাধার পিঠ থেকে নেমে গাধার দুটো দুটো পা দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে দুজনে কাঁধে নিয়ে চলল।

যাবার পথে হাটের কাছেই পড়ল একটা খাল। সেই খালের ওপর সাঁকো ছিল। বাবা আর ছেলে গাধা কাঁধে ওই সাঁকোর ওপর উঠতেই হাটের লোকেরা তাদের কাণ্ড দেখে এমন হাসিঠাট্টা ও চিৎকার শুরু করল যে গাধাটা ভয় পেয়ে ছটফট করতেই পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল আর গাধাটা খালের জলে পড়ে গিয়ে দম আটকে মারা গেল।

গাধার মালিক কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু ধাতস্থ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল— যে যা বলেছে তা শুনে আমি খুব ভুল করেছি, কিন্তু কাউকেই খুশি করতে পারলাম না।

ছোটো বন্ধুরা, একথা মনে রাখবে, যারা সবাইকে খুশি করতে চায়, তারা কাউকেই খুশি করতে পারে না।

উজ্জ্বল কুমার দাস

বীর বনবাসী

বিরসা মুণ্ডা

ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্ম ১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ সালে ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলার উলিহাতু গ্রামে। তিনি মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে উলগুলান আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জনজাতি সমাজের মানুষের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি মানুষকে মুখে অন্ন জোগানোর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। জনজাতি সমাজের মানুষেরা তাই তাঁকে 'ধরতী আবা' নামে সম্বোধন করতেন। তাঁর উলগুলান আন্দোলন বঙ্গ, বিহার ছাড়াও মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, গুজরাটেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। ১৯০০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে চক্রধরপুরের কাছে জঙ্গলে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে রাঁচী জেলে রাখা হয়েছিল। জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- রিকশার রাজধানী বলা হয় ঢাকা শহরকে।
- পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা ২২৭২ কিলোমিটার।
- বর্তমানে ভারতে মোট ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
- ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী দেশ মালদ্বীপ।
- ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্ত হলো কন্যাকুমারী।
- ভারতের অরুণাচল প্রদেশে প্রথম সূর্যোদয় দেখা যায়।
- স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রকৃত নাম মূলশঙ্কর।

ভালো কথা

সহাবস্থান

সেদিন স্কুলে যাবার সময় একটা ঘটনা দেখে আমি অবাক হলাম। রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে চার-পাঁচটা কুকুর ময়লা ঘাঁটছে। দশ-বারোটা কাকও রয়েছে। দুটো হুলো বেড়াল কী যেন খাচ্ছে। একেবারে অবাক কাণ্ড হলো, তিনটে ইঁদুরও একই সঙ্গে আবর্জনায় পড়ে থাকা খাবার খাচ্ছে। একটা কাক একটা ইঁদুরের লেজে একটা টোক্কর দিতেই ইঁদুরটা কাকের দিকে তেড়ে গেল। কাকটা ভয়ে একটু দূরে গিয়ে বসল। আমি দাঁড়িয়ে ওই কাণ্ড দেখছিলাম। পাশ দিয়ে একজন দাদু যাচ্ছিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দিদিভাই, এটাকে সহাবস্থান বলে।

শ্রেয়া মুখার্জী, নবম শ্রেণী, বালিগঞ্জ, পিবি সরণী, কলকাতা-১৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) রা প্তা চো

(২) ছ ছা ন্ন

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ড় বি নি সু য়া ছা

(২) নু ন দ্রা ন্ধা ছি স

১৬ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) ফুসমন্তর (২) বাঁধনহারা

১৬ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) মলিনবসন (২) মুকুটশোভিত

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (২) পারমিতা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।
(৩) সুজিত মাহাত, চিঙ্গিশপুর, দঃ দিনাজপুর। (৪) অনন্যা সাহা, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

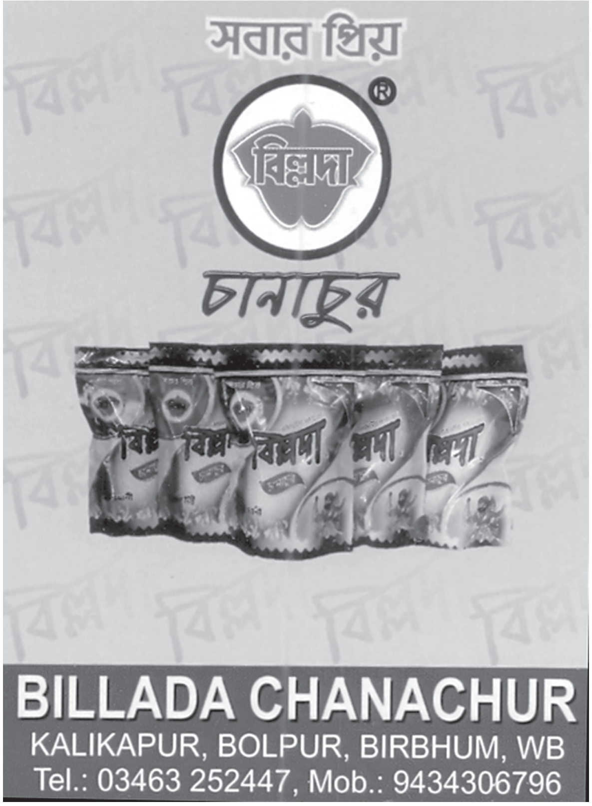

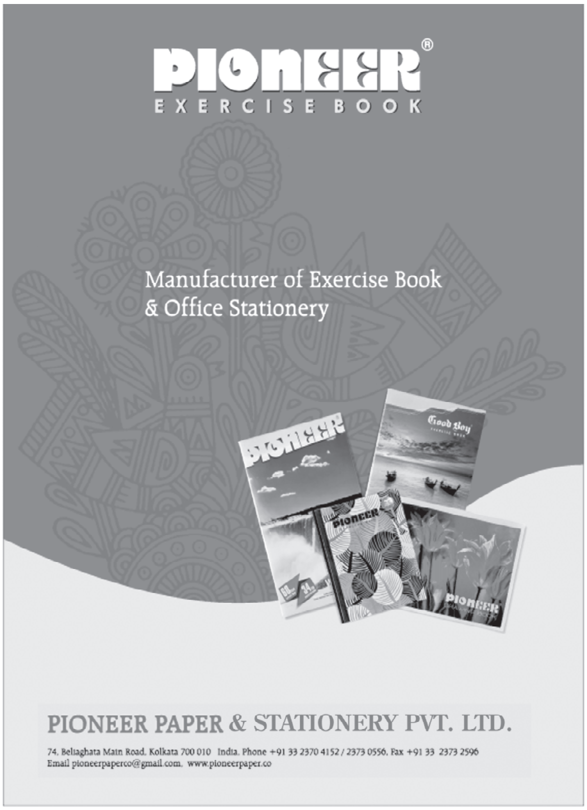

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

আদ্যাশক্তি মহাকালী

সরোজ চক্রবর্তী

মা কালী বা দেবী কালিকা হলেন শক্তির দেবী। তিনি দেবী দুর্গা বা পার্বতীর একটি রূপ। তাঁকে মৃত্যু ও সময় পরিবর্তনের শক্তি বলে মনে করা হয়। তন্ত্র অনুসারে 'কালী' 'দশমহাবিদ্যা'র প্রথম দেবী। যে কাল সর্ব জীবের গ্রাসকারী, সেই কালেরও যিনি গ্রাসকারিণী তিনিই কালী। কালেরও নিয়ন্ত্রী শক্তি আছে। এই কালশক্তি'র প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি, মহাপ্রলয়ের সেই মহাকালই পুনশ্চ সমগ্র সৃষ্টিকে গ্রাসকারী। কিন্তু মহাকাল সেও পরিণামের অধীন। মহাপ্রলয়ে কালশক্তি মহাকালীর ভিতরেই লীন হয়ে যায়।

মা কালী আদ্যাশক্তিরূপিণী। কারণ তিনিই এই বিশ্বের আদি শক্তি ও সমস্ত শক্তির বীজ। ঋগ্বেদে ১০ : ১২৯ : ৩ মন্ত্রে বলা আছে— তৎকালে পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, উন্নত স্থলও ছিল না। তবে কিছুই কি ছিল না? ছিল এক সুগভীর আদি-অন্তহীন অন্ধকার। এই অনাদি অন্ধকারকে তন্ত্রশাস্ত্র নাম দিয়েছে আদ্যাশক্তি কালীরূপে।

কালী হলো সময় বা কালের পূর্ণতা। এর স্ত্রীলিঙ্গ রূপ যার পুংলিঙ্গ বিশেষ্য কাল, যা ভগবান শিবের নাম। এই শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ' (কালো) বা ঘোর বর্ণ। সমজাতীয় কাল যার অর্থ নিযুক্ত সময়, আর কাল অর্থ কালো— এই দুটি শব্দের অর্থ আলাদা। কিন্তু এগুলি জনপ্রিয় ব্যুৎপত্তিবিদ্যার মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। তাকে বলা হয় কালীমাতা (অন্ধকার মা) এবং এছাড়াও কালী যা এখানে সঠিক নাম বা বর্ণনা হিসেবে গাঢ়নীল পড়া যেতে পারে। যদিও কালী শব্দটি অথর্ববেদের প্রথমদিকেই আবির্ভূত হয়, তবে সঠিক নাম হিসেবে এটির প্রথম ব্যবহার কাঠক গৃহ্যসূত্রে (১৯.৭)। ডেভিড কিন্সলির মতে, কালীকে হিন্দু ঐতিহ্যে সর্বপ্রথম ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্বতন্ত্র দেবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই গ্রন্থগুলি সাধারণত তাঁকে হিন্দু সমাজের পরিধিতে বা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপন করে। তাঁকে প্রায়শই শিবের শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিভিন্ন পুরাণে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ষষ্ঠ শতাব্দীর দেবী মাহাত্ম্য যুদ্ধক্ষেত্রে তার সবচেয়ে পরিচিত চেহারা। দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়ের দেবতা হলেন মহাকালী।

বেদের রাত্রি সূক্তই পরবর্তীকালে কালীর ধারার সৃষ্টি করেছে। শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নৈঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে কালীর নাম প্রথম পাওয়া যায় মুণ্ডক উপনিষদে। সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি। এখানে কালী আহুতি গ্রহণকারিণী অগ্নিজিহ্বা মাত্র। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে দেখা যায় অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডব শিবিরে গিয়ে নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করছিলেন তখন পাণ্ডবগণ ভয়ংকরী কালীমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এ মহাদেবের বিবাহযাত্রায় কালী অনুগমন করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে চণ্ড-মুণ্ড এবং তাদের অনুচরেরা দেবী অম্বিকার নিকটবর্তী হলে দেবী অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করেন। তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ললাট থেকে অসি পাশধারিণী করালবদনা দেবী কালিকা আবির্ভূতা হন। তিনি একের পর এক অসুরকে বধ রক্তবীজকে মেরে তার শরীরের রক্ত পান করেন। কালীমাতা এভাবেই বিশ্বকে অসুরমুক্ত করেন।

কালীর অবির্ভাব তিথির বিবরণ কালী বিলাসতন্ত্রে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—

'কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পক্ষদশ্যাং মহানিশি।

আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনী কোটিভিঃ মহা।।'

অর্থাৎ কার্তিক মাসের অমাবস্যার মহানিশিতে মহাদেবীর এই ভূ-মণ্ডলে আবির্ভাব। এটাই তার আবির্ভাব তিথি। এদিন দীপাবলী বা দীপদান তথা দেওয়ালি রজনী। কার্তিক অমাবস্যার রাতে দীপদানে আলোকমালায় প্রজ্বলিত করে নিজেদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাওয়ারই নামান্তর দীপাবলী। আলোর মাধ্যমে শক্তি সাধনায় নিজেকে পুণ্যালোকে আলোকময় করে তোলাই জগতের মূলে শক্তি সাধনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সার্থকতা।

রামায়ণের দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, কার্তিক মাসের কৃষ্ণা অমাবস্যার রাতে রাবণবধ ও লঙ্কাবিজয় সম্পন্ন করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে দেওয়ালি অনুষ্ঠান হয়। সব কিছু মিলিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকমালায় প্রজ্বলিত অনুষ্ঠানকে আলোর পথে যাত্রার সূচনাই দীপাবলী বা দেওয়ালি বা দীপান্বিতা অমাবস্যা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমাদের অসৎ হতে সতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, অন্ধকার থেকে আলোতে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতত্ত্বে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। পরলোকগত স্বজন ও বন্ধুগণ যাতে ওইসব ভয়ংকর অন্ধকার অতিক্রম করে গন্তব্যস্থল অমৃতধামে যেতে পারেন তার জন্য ওই রাতে নদীর জলে জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসানোর প্রথা আছে কোনও কোনও স্থানে। আবার আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসব্যাপী আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে অশুভশক্তি তাড়ানোর ব্যবস্থা এতে নিহিত রয়েছে।

মা কালীর মূর্তি সংহারকারিণী মূর্তি। সংহারের প্রকৃত অর্থ সংহরণ অর্থাৎ নিজের

ফঃ ৬

ভিতর প্রত্যাকর্ষণ। যেমন সমুদ্র থেকে উৎপন্ন ঢেউ সমুদ্রেই লীন হয়, যেমন মাকড়সা স্বীয় জাল ইচ্ছানুসারে নিজের ভেতরেই গুটিয়ে নিতে পারে তেমনি। জেলে যেভাবে জাল বিস্তার করে পুনরায় নিজের দিকে টেনে নেয় তেমনি। অর্থাৎ এই সংহার মানে পুনঃসৃষ্টি, কেবলই ধ্বংস নয়। এই সংহারের অর্থ নির্ভয়ে আশ্রয়, মাতৃকোলে ও মাতৃবক্ষে সন্তানের প্রত্যাবর্তন।

'শিবের বুকে কালী'-এর অর্থ হলো শিবরূপে মা কালী নির্গুণ ঈশ্বর আর সগুণ রূপে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ন্ত্রী। মা কখনো নিষ্ক্রিয়া— যখন কোনও সৃষ্টিই ছিল না তখন নিষ্ক্রিয়া। কখনো সক্রিয়া, যখন সৃষ্টির প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে তখন সগুণ সক্রিয়া। নির্গুণ ঈশ্বরের বুকে যখন শক্তির প্রকাশ ঘটে তখনই তা সৃষ্টি সক্ষম হয়ে ওঠে। তাই নির্গুণ শিবের বুকে শক্তিরূপিণী মা। তিনিই শিব। তিনিই কালী।

মা কালী দিগম্বরী অর্থাৎ বসনহীন। কেননা ঈশ্বর সর্বব্যাপী। সর্ববৃহৎ, তাকে আচ্ছাদিত করার মতো আর বৃহৎ কিছু নেই। তাই মা বসনহীন। এই আচ্ছাদন অবিদ্যা ও অহং-এর প্রতীক। সকল অবিদ্যা, মোহ ও অহমিকার আচ্ছাদন পরিত্যাগ করলে তবেই ঈশ্বরের দেখা মেলে। মায়ের গলায় থাকে মুণ্ডমালা। কারণ মা বাগীশ্বরী, শব্দব্রহ্মময়ী। তার কণ্ঠে পঞ্চাশ মুণ্ড, পঞ্চাশটি বর্ণের প্রতীক। অন্য অর্থে, মুণ্ডমালা— মস্তিষ্ক তথা জ্ঞানের প্রতীক। মুণ্ডমালা বিভূষিকা দেবী ব্রাহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞানকে ধারণ করেন। জগতের সকল জ্ঞান ও তত্ত্বের প্রকাশ হয় এই বর্ণ তথা ধ্বনির মাধ্যমে। মা সকল জ্ঞানশক্তির আধার, তাই তার গলায় মুণ্ডমালা। মস্তিষ্ক হচ্ছে জ্ঞানের আধার। মায়ের হাতে ঝুলন্ত মস্তিষ্ক আমাদের জ্ঞান শক্তিতে বলীয়ান হতে শিক্ষা দেয়। জ্ঞান দ্বারাই আমরা অজ্ঞানকে ছেদন করতে পারি।

সকলকে শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা—

সৌজন্যে :

ড: কমল ভট্টাচার্য

অচ্যুত হাজরা

মায়ের কটিদেশে কাটা হাত থাকে। এই হাত হচ্ছে কর্মের প্রতীক। জীবের জন্মজন্মান্তর প্রক্রিয়া এই কর্মের দ্বারাই নির্ধারিত। সকাম কর্ম বন্ধনের কারণ তাই কর্তিত হাত মায়ের যোনিদেশের কাছাকাছি। অর্থাৎ সকাম কর্মকে পরিত্যাগ না করতে পারলে জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী। এ কারণেই মা ছিন্নহস্ত কটিদেশে ধারণ করে আছেন।

শ্রীশ্রী কালীমাতা চতুর্ভুজা। সকাম ও নিষ্কাম— সাধক সাধারণত এই দুই প্রকার। সকাম সাধক সংসারে সাফল্য চান আর নিষ্কাম সাধক চান মুক্তি। মায়ের দক্ষিণ হাতে সকাম সাধককে অভয় ও বর দিচ্ছেন। আর বামহাতে খড়্গ দ্বারা নিষ্কাম সাধককে মোহপাশ ছিন্ন করতে বলছেন। কালো কেশ আকর্ষণ করে মা তমোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলছেন। যেহেতু রক্ত রাজসিক গুণের প্রতীক। তাই মা মস্তিষ্ক থেকে অসারিত রক্তের ধারা শোষিত করে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে শিক্ষা দিচ্ছেন। গীতার শ্লোকে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা-ই মাতা কালীর প্রতিমায় লুকিয়ে রয়েছে। চণ্ডীতে বর্ণিত মাতৃরূপের এই প্রতিমা প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় গীতার সমগ্র দর্শনকেই ধারণ করে আছে।

পুরাণ অনুসারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয় ভগবান শিব হতে। তিনি শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ এবং সমস্ত জীবের জননী। নির্দোষকে, সৎকে, শুভশক্তিকে রক্ষা করার জন্য তিনি অশুভ শক্তি, অসৎশক্তি, মন্দকে ধ্বংস করতে আবির্ভূতা হন। তন্ত্র পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকাল সংহিতা অনুস্মৃতি প্রকরণে নয় প্রকার কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন— দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধনকালী, সিদ্ধিকালী, চণ্ডিকাকালী। আবার কোথাও সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, রক্ষাকালী, কঙ্কালকালী, ডম্বরকালী প্রভৃতি নামেও পূজিতা হন। কোনো মন্দিরে আবার ভবতারিণী, আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ী ইত্যাদি নামেও মা কালীর পূজা বা উপাসনা করতে দেখা যায়।

হিন্দুধর্মে কালীকে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানীগণ অদ্বৈতবাদে চিন্তা করেছেন। বৈষ্ণব শিরোমণি ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন— 'যঃ কৃষ্ণঃ শৈব দুর্গা স্যাৎ/যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।' অর্থাৎ যে কৃষ্ণ সেই দুর্গা এবং যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। আবার শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা সাধক ও ভক্ত কবির দল তাঁদের উপাস্যা, আরাধ্যা দেবীকে কন্যা ও জননীরূপে উপাসনা করেছেন। তাঁদের সৌন্দর্য দৃষ্টির মুগ্ধ আরতিতে শ্মশানচারিণী, মুণ্ডমালাধারিণী ভয়ংকরী দেবীমূর্তি স্নেহকোমলা মাতৃমূর্তিতে ও সন্তানে পরিণত। আগমনী-বিজয়াপদে ঐশ্বর্যময়ী কালিকা কোমলাঙ্গী মধুরা কন্যা। শাক্তকবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত উপলব্ধি করেছিলেন পরমসত্যের লীলাই সৃষ্টির মূলীভূত সত্য। শাক্ত কবিও কৃষ্ণ ও কালীর মধ্যে কোনও ভেদ খুঁজে পাননি। তাই শাক্ত কবি বলেন— 'কালী হলি মা রাসবিহারী'। এখানে শ্যাম ও শ্যামা একই।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের একনিষ্ঠ কর্মী সন্দীপ চক্রবর্তী (সন্দীপদা) গত ১ নভেম্বর ইহলোকের যাত্রা সাঙ্গ করে পরলোকে গমন করেছেন। গত কয়েকমাস তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মাসখানেক কলকাতার নাইটিংগেল নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। ১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

হাওড়ার ক্ষীরেরতলার পৈতৃক বাড়িতে দুই ভাই-বোন থাকতেন। । সন্দীপ চক্রবর্তীর জন্মস্থান হাওড়া জেলার তাজপুর গ্রামে। তাঁর ঠাকুরদা প্রসাদ চক্রবর্তী জাতীয়তাবাদী ঘরানার মানুষ ছিলেন; ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল গভীর সখ্য।

অকৃতদার সন্দীপদা যে কোনো মানুষের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে পারতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সবাইকে আকৃষ্ট করত। নীরবে অক্লান্তভাবে নিজের দায়িত্ব পালনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পড়াশোনা ও জানার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। স্বস্তিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা ছাড়াও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প-উপন্যাস গ্রন্থ আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

সন্দীপ চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণে স্বস্তিকা পরিবার মর্মাহত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তিলাভ করুক।

With Best Compliments From :-

GITAM CONSTRUCTION

DURLAVGANJ
PASCHIM MEDINIPUR

শাসক দলের সুপ্রিমো কি এখন নজর বন্দি না নিজের দলের ঘনিষ্ঠের চালে গৃহবন্দি?

বিশ্বপ্রিয় দাস

একেবারে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা রাজ্যের শাসক দলের। অনেকটা আটহাতি গামছা পরে শরীর ঢাকার চেষ্টা। একদিকে ঢাকার চেষ্টা করলে অন্যদিকে খুলে যাচ্ছে। দুর্নীতি আর দুর্নীতির ফাঁসে এখন দমবন্ধ অবস্থা গোটা শাসক দলের। সম্প্রতি তাঁরা দিল্লি অভিযান করেছিলেন। দাবি ছিল একশো দিনের কাজের টাকা আদায়। একটা গোটা নাটকের দল দিল্লি গিয়ে ধরনা দিল। এমনকী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার নাটক করেও দেখা করলেন না আন্দোলনকারীরা। যিনি গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যেতি, এরাজ্যে এসে শাসক দলের মুখ ও মুখোশের বিষয়টা সর্বসাধারণের সামনে খুলে দিয়েও গেলেন। কেননা তাঁর বিরুদ্ধে এই শাসকদলের নেতারা এসে যে ভুল বার্তা দিয়েছিলেন যে তিনি অন্য রাস্তা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেটাও সাধ্বী একেবারে খোলসা করে দিয়ে যান। তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, প্রতিদিন তিনি যে ৪ নম্বর গেট দিয়ে বেরোন, সেটা দিয়েই তিনি চলে গিয়েছিলেন, এমনকী রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষাও করেছিলেন। মিথ্যার একটা সীমা থাকে। যে মিথ্যাচার শাসক দলের সুপ্রিমো আমাদের রাজ্যে প্রচলন করেছেন, এখন তাঁর ব্যাটন নিয়ে চলতে থাকা, সেকেন্ড ইন কম্যান্ডও সেই ধারাকে আরও মার্জিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। রাজ্যের কী পাওনা, কতটা পাওনা, কেন কেন্দ্র দিচ্ছে না, ইতোমধ্যে সংবাদমাধ্যমে বহুচর্চিত। তাই সেই প্রসঙ্গের অবতারণা আর না করাই ভালো। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার কেন্দ্রের সরকার আরও বহু উন্নয়ন খাতে যে সব টাকা পাঠিয়েছে, সেই টাকার একটি সামান্য শতাংশ মাত্র খরচা করতে পেরেছে এই সরকার। কই, সে কথা তো একবারের জন্য বলছে না। আদালত তো বলেই দিয়েছে, যারা প্রকৃত, তাঁদের পাওনা মেটানো হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই বার্তাও গেছে। আর ভুয়ো যারা তাঁদের বাতিল করা হোক। কিন্তু এতদিন হয়ে গেলেও বাছাই কেন হলো না বা প্রকৃত উত্তর কেন দেওয়া হলো না, সেটাও কিন্তু বিচার্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক মহল বলছে, যদি কেন্দ্র বঞ্চিত করে থাকে, তাহলে আদালতে কেন যাচ্ছে না রাজ্য?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বারে বারে হুংকার ছাড়তে থাকা সেকেন্ড সুপ্রিমো কেন আদালতের রক্ষাকবচ নিতে দ্বারস্থ হচ্ছেন বারে বারে? কেনই-বা তিনিও তাঁর দলের শাসনে থাকা রাজ্যের নানা দুর্নীতির থেকে চোখ ঘুরিয়ে দিতে থাকছেন অন্য প্রসঙ্গ এনে। যখন দিল্লি গিয়ে সফল হলেন না, বেছে নিলেন রাজভবন। যেখানে তিনি নিয়ম ভাঙলেন। ইচ্ছে করেই এসব করছেন নাকি?

একবছর হয়ে গেল মহাসচিব বন্দি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, মহাসচিবকে সরানোর সুকৌশল চাল একেবারেই সফল কোনো একজনের অঙ্গুলি হেলনে। ওই মহলের মতে, তৃণমূল দলটি প্রকৃত অর্থে চলত ওই মহাসচিবের বুদ্ধিতে। এমনকী মানি ম্যানেজমেন্ট পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হতো ওই গুরুর হাত ধরেই। তৃণমূল কংগ্রেস দলটিকে একটি কর্পোরেট চেহারা দেবার কারিগর ছিলেন তিনি। এই বিষয়টিকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিবারের অন্য সদস্যরা মানতে পারছিলেন না। এমনকী সেকেন্ড ইন কম্যান্ড কিছুতেই দলের মাথা হয়ে উঠতে পারছিলেন না। অনেকে বলছেন, পরিকল্পনার নিখুঁত রূপায়ণ পার্থ বধ। এক সেকেন্ড লাগেনি দল থেকে ছেঁটে ফেলতে। পার্থ চ্যাটার্জি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি এভাবে তাঁকে ছেঁটে দেবে। শুধুই কি একটি উদ্দেশ্যই ছিল, নাকি সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ও তাঁর দলবলের আরও কোনো বড়ো উদ্দেশ্য আছে? তৃণমূলের অন্দরের সুপ্রিমো অনুগামীদের একটি গোপন সূত্র বলছে, সুপ্রিমোকে ক্ষমতাহীন করে তৃণমূল কর্পোরেট ব্যবসার সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার জন্য একটি ধীর গতির পন্থা চলছে। সেটা রাজনৈতিক মহলের অনেকেই আড়ালে আবডালে বলছেন সেকথা। তাহলে কি সুপ্রিমোও বুঝতে পেরেছেন কিছু? তিনি কি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর ডানার পালকগুলিও একে একে খসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি নিজে রাজনৈতিক ভাবে জড়বৎ হয়ে পড়ছেন। একথা তিনি হয়তো বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারছেন না বা করার ক্ষমতাও এই মুহূর্তে নেই তাঁর।

সম্প্রতি সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে দেখা যাচ্ছে কাঁধে আবেদনের বান্ডিল নিয়ে নাটক করতে। মুখে না কামানো দাড়ি। একেবারে নিখুঁত মেকআপ। নিখুঁত নাটুকে চলন ও অভিনয়। কিন্তু এই নাটক যে বড়ো মেলোড্রামাটিক, চড়া মাপের অভিনয় সাধারণ মানুষও ধরে ফেলেছেন। এই কাঁধে নেওয়া বান্ডিলের ছবি পোস্টার হবে।

সুপ্রিমো আবার এখন বাড়িতে বন্দি। যদি এই মুহূর্তে নির্বাচন থাকত, তাহলে হুইল চেয়ার উপবিষ্ট হয়ে হুংকার ছাড়তে দেখা যেত মঞ্চে মঞ্চে। তিনি নাকি সেই নভেম্বরে বেরোবেন। নাকি তাঁকে এর আগে বাইরে বেরোতে দেওয়া হবে না? সেই প্রশ্ন অর্বাচীন বিরোধীদের কেউ কেউ মশকরা করে করছেন। আসলটা যে কী ওই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সুপ্রিমোর বাড়ির অন্দরমহলে ঘটছে তা জানার উপায় নেই। তিনি নাকি খুবই অসুস্থ। তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে, তাঁর মেডিকেল বুলেটিন কেন নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে না? চিন্তা তো সাধারণ মানুষের সবারই হয়। আসলে সেকেন্ড ইন কমান্ড চাইছে, সুপ্রিমোকে একেবারে আড়ালে রেখে, নিজের আখের গোছাতে। এটাই প্রমাণ হবার দিকে এগোচ্ছে।

সব শেষে দুটি কথা : (১) রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে নানা ভাবে দুর্নীতির যে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে এবং তা প্রমাণিত সত্য হবার দিকে এগোচ্ছে, সেটিকে সামাল দেবার জন্য নানা ইস্যু তৈরির চেষ্টা করে চলেছে। (২) শাসক দলের সুপ্রিমোর ক্ষমতাকে একেবারে শেষ করে, সেকেন্ড ইন কম্যান্ড নিজেকে সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই লক্ষ্য পূরণ পাখির চোখ হিসেবে রেখেই কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের ঝাঁঝ যে আগামী দিন আরও বাড়াবে, সেটা বলাই যায়।

রামমন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন ৮ হাজার রামভক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আগামী বছর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিরাপত্তাজনিত কারণে উপস্থিতির সংখ্যা ৮ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। অযোধ্যার সর্বত্র বড়ো জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়ে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারবেন আগত রামভক্তরা। ওই দিন অযোধ্যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৪০টি সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তরা রামলালার অভিষেকে উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন। প্রায় ৫০০ মিটার পথ খালি পায়ে মূর্তি হাতে হাঁটবেন প্রধানমন্ত্রী। এভাবেই অস্থায়ী মন্দির থেকে রামমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করবেন রামলালা। প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রস্তাব ট্রাস্টি কমিটির পক্ষ থেকে শীঘ্রই দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। রামলালার অভিষেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেদিন মন্দিরের পূজাতে যজমানের দায়িত্ব পালন করবেন মোদীজী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা রামভক্তরা যাতে ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন না হন, সেই জন্য তাদের সহায়তা করার জন্য ভাষা নির্দেশিকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অযোধ্যায় প্রতিদিন ২৫ হাজার ভক্তদের থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। মন্দির উদ্বোধনের পর থেকে ৪৫ দিন ধরে এই আয়োজন চলবে। আনুমানিক ৫০ লক্ষ ভক্ত অযোধ্যায় আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভাষাগত, ভৌগোলিক ও আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকরাও যাতে রামমন্দির দর্শন করতে পারেন, তারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। ট্রাস্ট মনে করছে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছাড়াও রামমন্দিরের উদ্বোধন অযোধ্যা ও সংলগ্ন অঞ্চলে পর্যটন শিল্পকে উৎসাহিত করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হবে।

শোকসংবাদ

বহরমপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক, পূর্বতন প্রচারক সোমনাথ মুখার্জি গত ৫ নভেম্বর প্রয়াগরাজে তীর্থ করতে গিয়ে পরলোকগমন করেছেন।

* * *

সুকুমার করণের পিতা নলিনীকান্ত করণ গত ১৩ অক্টোবর রাউরকেল্লাতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সকলের জন্য দীপাবলীর শুভেচ্ছা রইল—

সৌজন্যে :

Umesh Ganeriwala

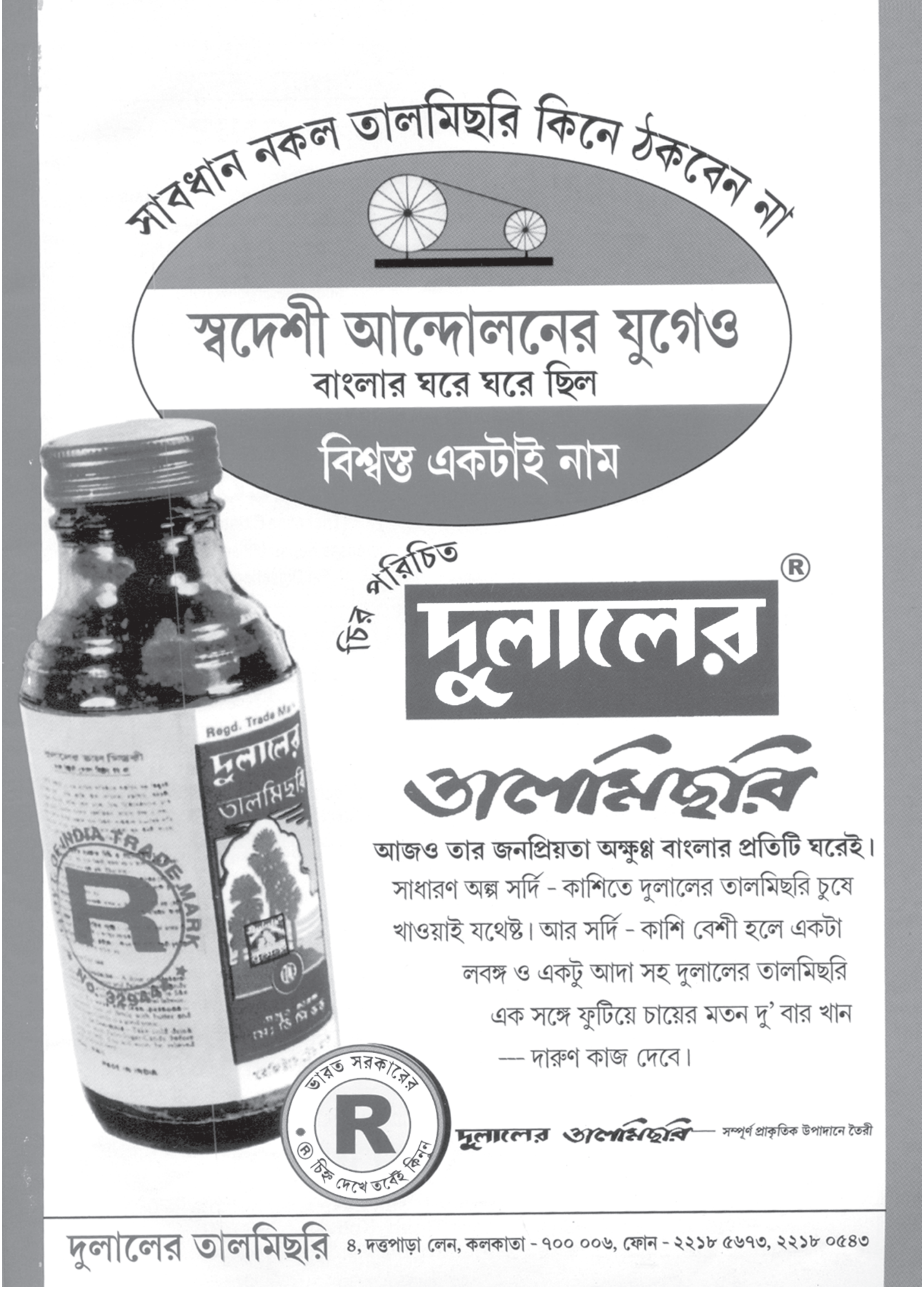

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor, Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854, Kolkata - 700 001
Phone (O) 40086996

With Best Compliments from :

SINGHANIA & CO.

7B, Kiransankar Roy Road
2nd Floor, Kolkata - 1